১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন। এতে আছে স্বচ্ছ অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র, ৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র। এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন কী বিস্ময় সৃষ্টি করে।

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার ঃ

কলকাতা ঃ কে দণ্ডপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪১৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন ঃ ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী ঃ** এইচ. ভি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফান্সী বাজার, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০১ ফোন ঃ ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

আনন্দমেলা

বিশেষ রচনা

হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হো-বুড়োর খুদে বন্ধু। শৈলেন ঘোষ ৩৫

গল্প

আমি ভূত। সুব্রত সেনগুপ্ত ১৩
চাঁপাফুলের গন্ধ। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

জঙ্গলের গল্প

মুভি ক্যামেরা ও একটি গোঁয়ার গণ্ডার। মঞ্জরী লাহিড়ী ২৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২
শয়তানের চোখ। সমরেশ মজুমদার ৫১

শার্লক হোমসের গল্প

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫

ছড়া ও কবিতা

মেছুড়ে। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
লোকটা। রথীন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৩

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্য ৩০

লেখাপড়া

প্রতিবেদন…পণ্ডিতম্মন্য (অর্থ জানো)। দেব-সেনাপতি ৫
প্রভাকর (সহজে ইংরেজি)। প্রসাদ ৫

খেলাধুলো

লেগুলের লাভ 'সোনার র‍্যাকেট'। সম্রাট রায় ৬৩
মোহনবাগানের রোভার্স জয়। অশোক রায় ৬৫
ডুরাণ্ড কাপ মোহনবাগানের। সুব্রত সিংহ ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ডাক্তারবাবু বলছেন ৫৩
ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮, মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ— অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন
একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর
মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা
বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই
কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

OBM/3726 BEN

প্রতিবেদন…পণ্ডিতম্মন্য…

আমরা যেমন পিতা-পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করি, শব্দের বেলাতেও তাই। কত যুগ-যুগান্তর পার হয়ে তা আমাদের অধিকারে আসে। সেই স্বত্বকে ভুলে যাওয়া বা হাতছাড়া করা তো নির্বুদ্ধিতা। শব্দের অর্থ জানো, আর সে-সম্পদ সঞ্চিত রাখো। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **খেই**—(ক) দিক, (খ) সুতার প্রান্ত, (গ) চিন্তা, (ঘ) কথা।

২। **চুনট**—(ক) ইস্তিরি করা, (খ) ঝকঝকে ধোয়া, (গ) কোঁচানো, (ঘ) ভাঁজ-ভাঙা।

৩। **প্রতিবেদন**—(ক) সমবেদনা, (খ) বেদনার মতো, (গ) গভীর বেদনা, (ঘ) বিবরণী।

৪। **পণ্ডিতম্মন্য**—(ক) মহাপণ্ডিত, (খ) যে পণ্ডিতের বাক্য মান্য করা হয়, (গ) যিনি নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন, (ঘ) যিনি পণ্ডিত নন।

৫। **খোরপোশ**—(ক) থাকা ও খাওয়া, (খ) খাদ্য ও বস্ত্র, (গ) খাওয়া ও বাঁচা, (ঘ) রক্ষণাবেক্ষণ।

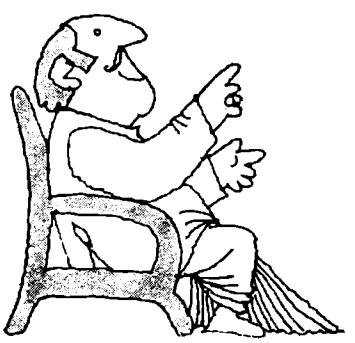

উত্তর : ১। **খেই**—(খ) সুতার প্রান্ত। যেমন, 'ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। শব্দটি অর্থবিস্তারে 'প্রসঙ্গ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, গল্পের খেই হারিয়ে ফেলা।

২। **চুনট**—(গ) কোঁচানো। যেমন, চুনট করা ধুতি।

৩। **প্রতিবেদন**—(ঘ) বিবরণী। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে রিপোর্ট। খবরের কাগজে এই শব্দটির ব্যবহার খুব দেখা যায়।

৪। **পণ্ডিতম্মন্য**—(গ) যিনি নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন, অর্থাৎ পাণ্ডিত্যহীন। যেমন, সংসারে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক।

৫। **খোরপোশ**—(খ) খাদ্য ও বস্ত্র। যেমন, 'যাত্রাদলের গান শিখিয়ে এত মাইনে! তার উপর খোরপোশ ফাউ!' (প্রমথ চৌধুরী)। সে খোরপোশের মামলা রুজু করল।

দেব-সেনাপতি

প্রভাকর

ইস্কুল ছুটির পর চম্বল সে-দিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। বেশ দূরের রাস্তা, কিন্তু কী জানি কেন, সে-দিন বাসে এত ভিড় ছিল, আর বাস এত দেরি করে করে আসছিল যে, তারা দু'জনে ঠিক করল, হেঁটে রওনা হওয়াই ভাল। আর, বন্ধু সঙ্গে থাকলে হাঁটা আর এমন কী কষ্ট?

Prabhakar Shinde is a particular friend of Chambal's.

Though a Maharashtriyan, Prabhakar speaks Bengali like a native.

He also speaks Hindi and English and, of course, Marathi, which is his mother-tongue.

Chambal has heard of the three-language formula.

Prabhakar seems to have learnt four languages without any difficulty.

পথ চলতে চলতে নানা রকম কথা হচ্ছিল। প্রভাকরই বেশির ভাগ কথা বলছিল, আর চম্বল শুনছিল।

Prabhakar started talking about the place where he was born.

"It's a small sea-side village not very far from Bombay," he said. "I don't remember it well. Ours is the end-house in a street running alongside the beach. Next to our house there's a cocoanut grove. Some nights, when I lie awake, I still seem to hear the night-time noises of the wind and the waves."

Chambal asked, "Don't you wish to go there again?"

Prabhakar said, "Father has promised to take us there this summer. The summer months are not the best time for going there. But we have to go then, because we wouldn't like to be away from Calcutta during the Pujas, and our winter-holidays are too short."

বিশেষ্যপদ কীভাবে স্থান ও কাল-বাচক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, লক্ষ করো :

sea-side village; night-time noises; end-house; summer months; winter-holidays.

প্রসাদ

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—দাম খুবই কম।

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568/R/BEN

এবার ফুস্‌ফুস্

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মাৎস্যযুগে দেখা গেল দুটো বিশিষ্ট গোষ্ঠী। একটিতে থাকল হাঙর আর তার নিকটাত্মীয়ের দল ; এদের শিরদাঁড়া ছিল নরম হাড় বা তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। অন্যটিতে থাকল কাঁটাওয়ালা মাছ ; এদের শিরদাঁড়ায় ছিল শক্ত হাড়গোড়। কাঁটাওয়ালা মাছ সংখ্যায় চটপট বেড়ে গেল। ক্রমে তাদের বংশধরদের দেহে ফুস্‌ফুস্ গজিয়ে উঠল। এটা হল প্রাণের দায়ে !

ফুসফুসের কাজ বাতাস থেকে অক্সিজেন বা অম্লজান টেনে নেওয়া। আর মাছ তো থাকে জলে। তার ফুলকো দিয়ে জল থেকে অনায়াসে সে অক্সিজেন নিতে পারে। এখন তো ভূভারতে এমন কোনও মাছই পাওয়া যাবে না, যার ফুসফুস্ আছে।

কেন তা হলে কাঁটাওয়ালা মাছের দেহে ফুস্‌ফুস্ গজিয়েছিল ?

না গজালে, আমাদের পূর্বপুরুষ সেই কাঁটাওয়ালা মাছেরা কবে মরে ভূত হয়ে যেত। পৃথিবীতে আমাদেরও আজ কোনও অস্তিত্ব থাকত না।

কেন ? না, দুনিয়ার হাল হঠাৎ বদলে গিয়েছিল।

মোটরগাড়ি ডাঙায় চলবে, জাহাজ চলবে জলে। জলে মোটরগাড়ি আর ডাঙায় জাহাজ অচল। তাই পৃথিবীতে যখন আচমকা খরা দেখা দিল, খালবিল নদীনালা সব শুকিয়ে গেল, তখন জলের মাছদের হল খাবি খাওয়ার অবস্থা। মরা প্রাণীদের পচা-গলা লাশ-জমা বদ্ধ জলায় জল তার অক্সিজেন হারাল। ফুস্‌ফুস্ থাকলে তবেই জলের ওপর ভেসে উঠে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নেওয়া সম্ভব। প্রাণের দায়ে তখন দেখা দিল ফুস্‌ফুস্‌ওয়ালা মাছ।

সেকালে আবহাওয়া ছিল একেবারেই খামখেয়ালি। কখনও একনাগাড়ে বৃষ্টি ; চারদিকে টইটম্বুর জল। তারপরই আবার দারুণ খরা ; শুকনো মাটি ফেটে চৌচির। একবার হাজা, একবার শুখা, এই ছিল তখনকার আবহাওয়ার ধরন।

খরার দিন শেষ হলে পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে জলে ছিল প্রচুর অক্সিজেন। সেই জলে ঠাঁই-পাওয়া মাছেরা তখন তাদের ফুলকোর সাহায্যে আবার অক্সিজেন পেতে লাগল। সে অবস্থায় তাদের ফুস্‌ফুস্‌গুলো হয়ে গেল মাছের পট্‌কা। পট্‌কা হল একরকমের থলি। এই থলিতে হাওয়া ভরে মাছ ওপরে ওঠে, তারপর হাওয়া বার করে দিয়ে নীচে নামে।

যে-সব মাছের ভেতর ভাসা ডোবার এই রকমের সাঁতারু থলি দেখা দিল, তাদের ছিল চমৎকার পাখ্‌না। সেই পাখ্‌নায় সূর্যের রশ্মির মতো ছড়ানো কাঁটার গায়ে চামড়ার ঝিল্লি। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এইসব মাছের নাম দিয়েছেন 'রে-ফিন্' বা 'রশ্মি-পাখনা'।

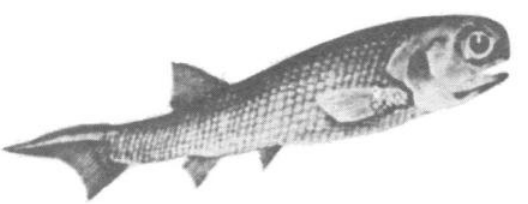

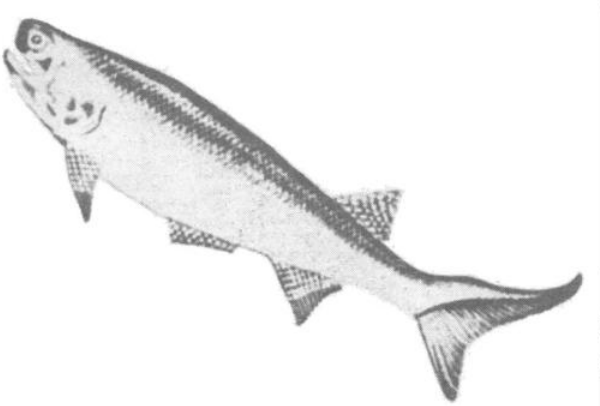

আজ আমরা যে বিশ হাজার রকমের মাছ দেখতে পাই, তারা সব এই 'রে-ফিন্'দেরই বংশধর।

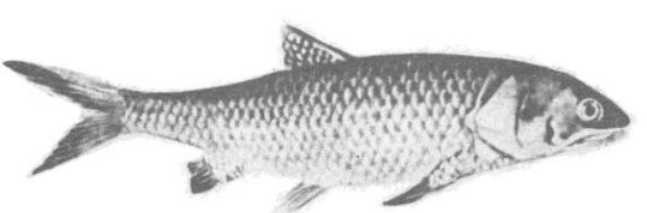

প্রাচীন পৃথিবীর রে-ফিন' মাছের বংশধর

এবার দেখুন কেয়ো-কার্পিন চুল!

এ' চুল আপনি খুলেই রাখুন, বিনুনী বাঁধুন, খোঁপাই করুন, বা যা খুশী তাই করুন

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

এবার আর আধুনিক সাজে সাজতে হলে মাথায় তেল মাখা বন্ধ করতে হবে না।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। এবার আপনি আপনার সুন্দর পরিপাটি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন–বিনুনী বাঁধুন, খোঁপা করুন বা হালফ্যাশন মাফিক চুল খোলাই রাখুন– আপনাকে সমান ভালো দেখাবে। আর কেয়ো-কার্পিনের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আপনাকে সারাদিন সতেজ রাখবে।

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়।

CLARION C-DMHO-1

হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যালির ধূমকেতুর কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। শিগগিরই যে আবার আকাশে তাকে দেখা যাবে, তাও তোমরা জানো নিশ্চয় ? এই যে বিখ্যাত ধূমকেতু, এরই বিষয়ে নানান তথ্য এখানে জানানো হয়েছে। লেখক শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সরকারের পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের ডিরেক্টর।

সূর্য এবং তার ন'টি গ্রহ নিয়ে তৈরি আমাদের সৌরমণ্ডল। ন'টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দূরত্বের কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছে। এই ন'টি গ্রহ হল, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এদের মধ্যে কোনও কোনও গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে, যেমন পৃথিবীর একটি উপগ্রহ চাঁদ। এই ন'টি গ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আছে অসংখ্য ছোট বড় নানা আকারের পাথরের টুকরো, যাদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ—এরাও অন্যান্য গ্রহদের মতোই নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে থেকে। গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আর যা আছে তা হল, ধূমকেতু ও উল্কা। এদের মধ্যে আকারে এবং

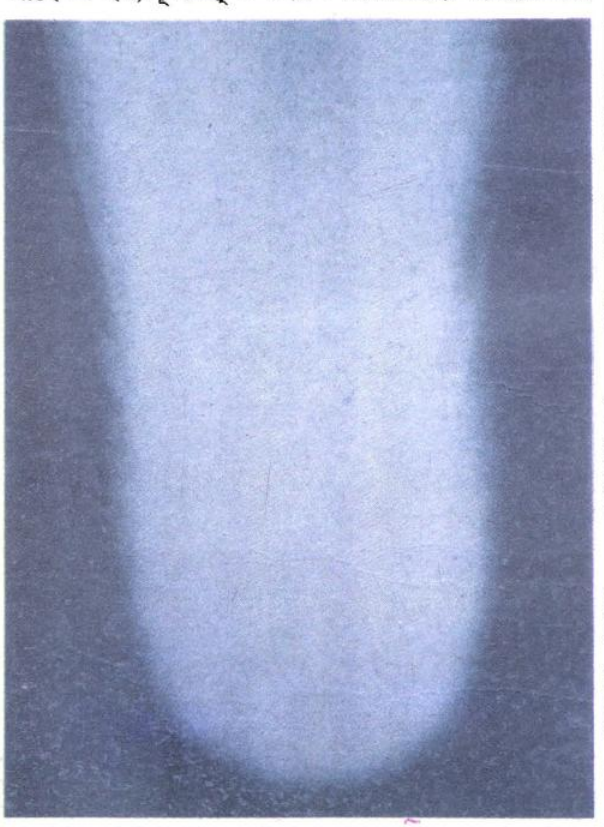

হ্যালির ধূমকেতুর মাথার ছবি (১৯১০)

এরেণ্ড রোলেণ্ড ধূমকেতু (১৯৫৭)

আচরণে সবচেয়ে অদ্ভুত হল ধূমকেতু। তোমাদের আজ এই ধূমকেতু সম্পর্কেই কিছু বলব।

আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে, রেডিওতে বা দূরদর্শনে তোমরা হ্যালির ধূমকেতুর খবর পাচ্ছ। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগে, হ্যালির ধূমকেতু কী ? হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে কিছু বলার আগে ধূমকেতু কী সেটা তোমাদের জানা দরকার। রাত্রিবেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখবে অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলছে। তারাগুলোকে যে জায়গায় আজ তোমরা দেখছ, আজ থেকে বহু বছর পরেও তাদের আকাশের ঠিক সেই একই জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে। আবার কখনও কখনও রাতের আকাশে কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো অবিকল

তারার মতোই দেখতে, কিন্তু কিছুদিন লক্ষ করলেই দেখা যাবে সেগুলো তারার মতো স্থির নয়, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। এইরকম চলমান জ্যোতিষ্কগুলোই হল গ্রহ। এদের বাদ দিলে, আকাশে তোমরা সবচেয়ে উজ্জ্বল যে জ্যোতিষ্ককে দ্যাখো, সে হল চাঁদ।

আকাশের ওই পটভূমিকায় যখন অকস্মাৎ ঝকঝকে মাথা ও ছড়ানো উজ্জ্বল লেজ নিয়ে ধূমকেতু উপস্থিত হয়, সত্যিই সে এক অপরূপ দৃশ্য। ধূমকেতুকে মানুষ দেখছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। আগেকার দিনে আকাশে হঠাৎ এমন ধূমকেতু দেখা গেলে মনে করা হত, বড় রকমের যুদ্ধ বা মড়ক হতে চলেছে। ধূমকেতু নাকি অমঙ্গলের প্রতীক। কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, এরকম ধারণার পিছনে সত্যিকারের কোনও যুক্তি নেই। ধূমকেতুর আবির্ভাব সৌরজগতের স্বাভাবিক ঘটনা, এর সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের শুভ-অশুভ জড়িয়ে নেই।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, বহুদিন পর্যন্ত আমাদের এমন ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু বাইরের কোনও জগৎ থেকে এসে সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং ছুটতে ছুটতে আবার সৌরজগতে থেকে বেরিয়ে চলে যায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু পরেও ধূমকেতু সম্পর্কে এমন একটা ধারণার চল ছিল। এ ব্যাপারে প্রথম পথ দেখালেন নিউটন। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন যে, ধূমকেতু সৌর-পরিবারের বাইরে অবস্থিত কোনও জ্যোতিষ্ক নয়, গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুর মতোই সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত এবং সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে।

অধিকাংশ ধূমকেতুই সে রকম উজ্জ্বল নয়, এদের পৃথিবী থেকে দেখতে হলে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরবিনের প্রয়োজন হয়। উজ্জ্বল ধূমকেতুর সংখ্যা খুব নগণ্য আর খালি চোখে দেখা যায় এমন উজ্জ্বল ধূমকেতু কদাচিৎ আকাশে দেখা যায়।

ধূমকেতুর চলার পথটা কেমন? ধূমকেতু যদিও সৌরপরিবারের জ্যোতিষ্ক, তবু তার চলার পথ আদৌ গ্রহের মতো নয়। তোমরা হয়তো জানো, গ্রহদের পরিক্রমণ-পথ এক একটা উপবৃত্ত। উপবৃত্ত হলেও গ্রহদের বেলায় এই পথগুলো প্রায় বৃত্তের মতো, একটা ছোট মুরগির ডিম যেমন একেবারে গোল নয়, একদিকে সামান্য একটু চাপা, সেই রকম। কিন্তু ধূমকেতুর বেলায় এই পরিক্রমণ-পথ এক-একটা সুদীর্ঘ উপবৃত্ত, তার মানে ডিমের আকৃতি না হয়ে একটা লম্বা পটলের আকৃতি। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে কোনও কোনও ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বছর। এমন অনেক ধূমকেতু আছে, যাদের এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখা গিয়েছে, তারপর মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। সাধারণত যেসব ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তের মতো, তাকে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা যাবেই। এদের বলা হয় নিয়মিত ধূমকেতু। কিন্তু ধূমকেতু লম্বা পটলের মতো উপবৃত্তাকার পথে চলে, আর সূর্য থাকে এই লম্বা উপবৃত্তের একটা দিক ঘেঁষে, তাই ধূমকেতু সূর্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়, আবার দীর্ঘ সময় পর পর সূর্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। এমন অনেক ধূমকেতু আছে, যেগুলো গ্রহরা যেদিকে চলে, তার উলটোদিকে চলতে থাকে।

এখন তোমাদের বলি ধূমকেতুর দেহ-গঠন কেমন। ধূমকেতুকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমত এর মাথা, ইংরেজিতে বলা হয় 'হেড', দ্বিতীয়ত এর ঝাঁটার মতো লেজ (টেল), মাথার আবার দুটি অংশ, একটি হল কেন্দ্রীয় অংশ (নিউক্লিয়াস)। রাসায়নিক বিচারে দেখা গেছে মুখ্যত জল, আর মিথেন অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রভৃতি জমাট বেঁধে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ গঠিত। আর ঘন জমাট-বাঁধা এই কেন্দ্রীয় অংশকে ঘিরে আছে হালকা গ্যাসের এক আবরণ, এই

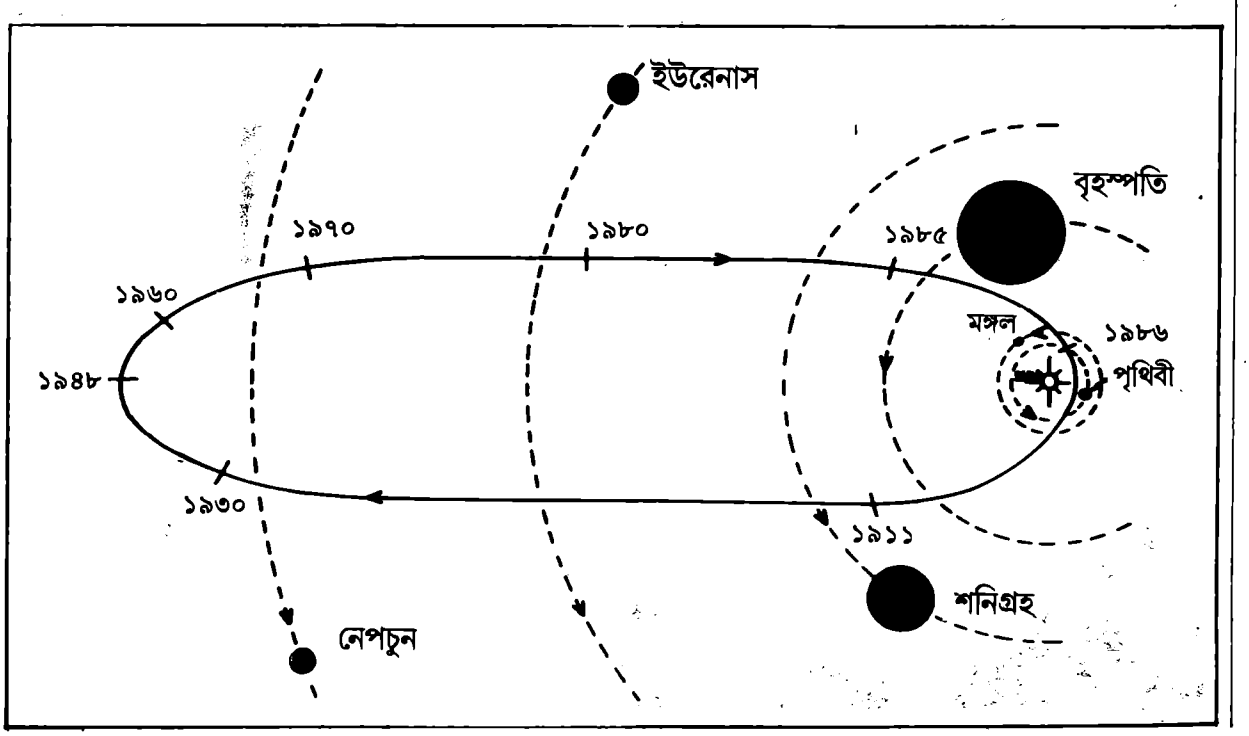

হ্যালির ধূমকেতুর পরিক্রমা-পথ

আবরণকে ইংরেজিতে বলে 'কোমা'। ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে, তখন একটা গোল আকারের পিণ্ড হিসেবে থাকে, যতই সূর্যের কাছে এগোতে থাকে ততই সূর্যের প্রবল মহাকর্ষের ফলে এবং প্রচণ্ড তাপে ধূমকেতুর গ্যাসীয় আবরণটি পরিমাণে বাড়তে থাকে, আর তখন সৌরবায়ুর চাপে ধূমকেতুর মাথার গ্যাসীয় আবরণ ক্রমশ সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। এর থেকেই ধূমকেতুর লেজের চেহারা ঝাঁটার আকার ধারণ করে। সাধারণত আকাশে ধূমকেতুর চেহারা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল, এর ঝাঁটার মতো লেজ, কিন্তু সব ধূমকেতুর লেজ থাকে না,আর যাদের লেজ গজায়, সেটা হয় সূর্যের কাছে এলে। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে এগিয়ে আসে, লেজটাও তত লম্বা হয়ে পড়ে। আবার যখন দূরে চলে যেতে থাকে, লেজটাও তত ছোট হতে হতে অবশেষে একেবারে মিলিয়ে যায়। সব সময়েই ধূমকেতুর লেজটা সূর্য যেদিকে থাকে, তার বিপরীত দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ধূমকেতু যখন সূর্যের নিকটতম অবস্থানে আসে, তখনই তার লেজ সবচেয়ে লম্বা হয় এবং সেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর কারণ হল, ধূমকেতুর নিজস্ব কোনও আলো নেই। ধূমকেতু থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে বলে আমরা তাকে দেখতে পাই। তাই সূর্যের কাছাকাছি না-আসা পর্যন্ত ধূমকেতুকে দেখা যায় না। কিন্তু আকাশে বিরাট আকৃতির লেজবিশিষ্ট একটা ধূমকেতুর ভর কিন্তু একেবারেই নগণ্য —পৃথিবীর ভরের এক লক্ষ ভাগের চেয়েও অনেক কম, এটা ভাবতে কী-রকম অবাক লাগে, তাই না ?

এখন তোমাদের ধূমকেতু সম্পর্কে একটা ধারণা হল। এবার তোমাদের বলব হ্যালির ধূমকেতু কী। পৃথিবী থেকে খালি চোখে যে-সব উজ্জ্বল ধূমকেতুকে আমরা নিয়মিত দেখতে পাই, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু। কিন্তু এই ধূমকেতুর নাম হ্যালির ধূমকেতু কেন হল, সেটা বড় মজার। এডমণ্ড হ্যালি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী (অ্যাস্ট্রোনমার রয়্যাল) এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের বন্ধু। ১৬৮২ সালে একটা অতি উজ্জ্বল ধূমকেতু আকাশে দেখা গেল। হ্যালি এই ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। রাতের পর রাত জেগে হ্যালি এই ধূমকেতুটির পরিক্রমণ-পথ, পরিক্রমণ-কাল ইত্যাদি নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন, অবশ্য এ-ব্যাপারে তিনি বন্ধু নিউটনের সাহায্যও নিয়েছিলেন। হ্যালি গণনা করে দেখলেন যে, সূর্যকে সম্পূর্ণ একবার ঘুরে আসতে এই ধূমকেতুটির সময় লাগা উচিত ৭৬ বছর। হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই ধূমকেতুটিকেই আবার দেখা যাবে পৃথিবীর আকাশে আগামী ১৭৫৮ সালে। হ্যালি তাঁর গণনার নির্ভুলতা দেখে যাওয়ার সুযোগ পেলেন না। ১৭৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সত্যি সত্যিই তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পরে ১৭৫৮ সালের বড়দিনের রাত্রে এই ধূমকেতুটিই আকাশে আবার ফিরে এল। তখন নির্ভুলভাবে এই ধূমকেতুর পরিক্রমণ-পথ ও পরিক্রমণ-কাল গণনা করে যাওয়ার জন্যে হ্যালির নামে এই ধূমকেতুটির নামকরণ করা হল হ্যালির ধূমকেতু (হ্যালিজ কমেট)। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধূমকেতুটি হ্যালিকে অমর করে রেখেছে।

এডমণ্ড হ্যালি

হ্যালির ধূমকেতুকে শেষবার পৃথিবীর আকাশে দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালে। এই অসাধারণ ধূমকেতুটির আবার সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসার কথা হল, ১৯৮৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ১৯১০ সালে এর পরিক্রমণের সময়, এটি যখন সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম অবস্থানে এসেছিল, তখন ধূমকেতু ও পৃথিবী দুটিই সূর্যের একদিকে ছিল, তার ফলে পৃথিবী থেকে হ্যালির ধূমকেতুকে অপূর্ব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আগামী বছরে ৯ ফেব্রুয়ারি সূর্যের যেদিকে ধূমকেতুটি থাকবে, তার ঠিক উলটো দিকে পৃথিবী আসবে, তার ফলে এবারে ধূমকেতুটির ঔজ্জ্বল্য ও লেজের দৈর্ঘ্য অনেক কম হবে। হ্যালির ধূমকেতু খালি চোখে কখন দেখা সম্ভবপর হবে ? ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে একে খালি চোখে দেখা যাবে, তবে তখনও খুব উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাবে না। এর পরে জানুয়ারির শেষে হ্যালির ধূমকেতু ক্রমশ সূর্যের এত কাছে এগিয়ে আসতে থাকবে যে, সেই সময় সূর্যের খুব কাছে আসার দরুন একে দেখা আর সম্ভবপর হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের একেবারে শেষের দিকে একে আবার ভোরের আকাশে পুবদিকে সূর্য উদয়ের আগে খালি চোখে দেখা যাবে, তখন এর উজ্জ্বলতা ও লেজের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বাড়বে। আশা করতে পারো যে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি হ্যালির ধূমকেতু যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ঝাঁটার মতো লেজ নিয়ে দেখা দেবে। গণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে, আর সেই সময়েই এটি হয়ে উঠবে পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল। এপ্রিলের শেষের দিকে একে আবার সূর্যাস্তের পর সন্ধেবেলায় পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে, কিন্তু এই সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্য ও লেজের দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমে আসবে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খালি চোখে একে

আর দেখা সম্ভবপর হবে না, দেখা যাবে শুধুমাত্র শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে।

হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে, এই বার্তা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু কেন ?

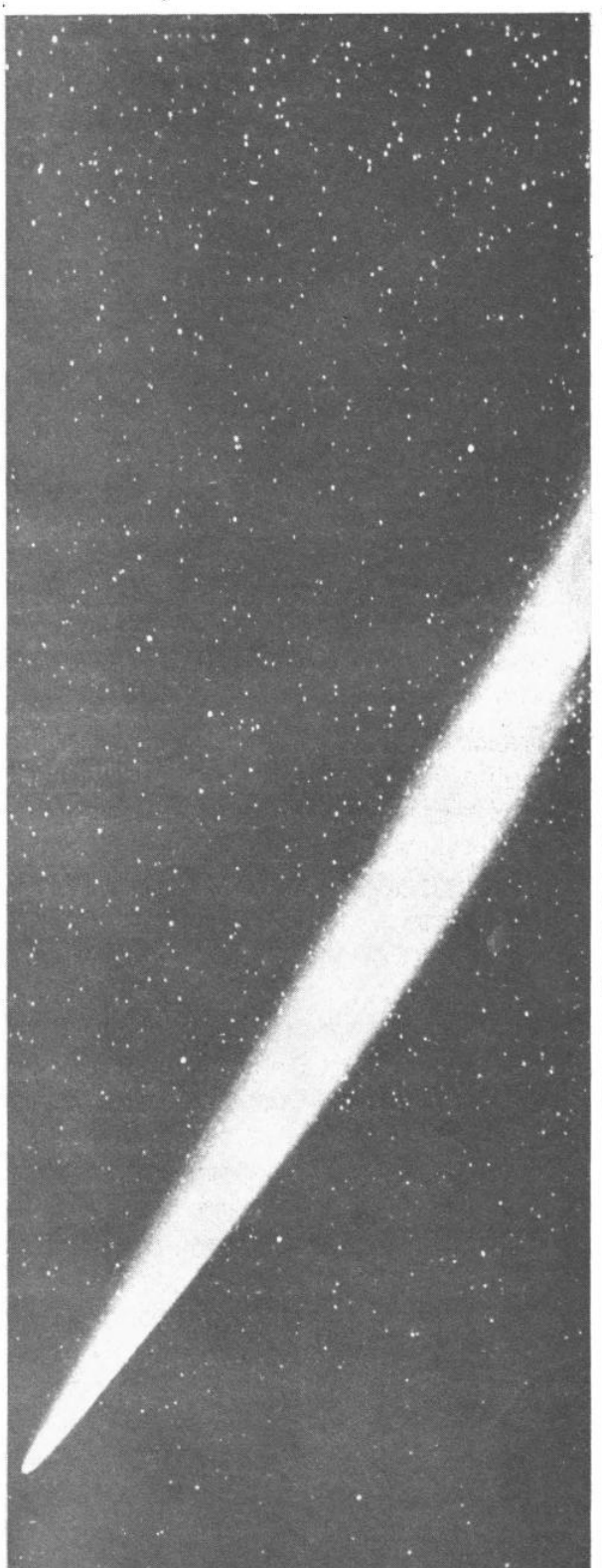

ইকিয়া সেকি ধূমকেতু। কোদাইকানাল মানমন্দির থেকে তোলা ছবি (১৯৬৫)

তার কারণ হল, ধূমকেতুকে নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞানীদের দখলে আছে অতি আধুনিক সাজসরঞ্জাম, শক্তিশালী দূরবিন ও রেডিও দূরবিন, মহাকাশযান প্রভৃতি। এই সব যন্ত্রপাতি সদ্ব্যবহার করে এবারের আবির্ভাবে হ্যালির ধূমকেতুর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে আবার ৭৬টি বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। তাই ১৯৮৬ সালের আবির্ভাবের সঙ্গে একটা মস্ত বড় সুযোগ বিজ্ঞানীদের সামনে এসে হাজির হবে। পৃথিবী জুড়ে যত মানমন্দির রয়েছে, সেগুলিতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। হ্যালির ধূমকেতুকে দূরবিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের জন্য জোর প্রস্তুতি চলেছে।

তবে **সবচেয়ে** চমকপ্রদ খবর হল, এবারে হ্যালির ধূমকেতুর আগমনের সময় পৃথিবী থেকে মহাকাশযান পাঠিয়ে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার পরিকল্পনা। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবিন দিয়েও তাকে পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার গঠন ও উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সুযোগে মহাকাশযান পাঠিয়ে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে আগ্রহী। এখন পর্যন্ত প্রধানত পাঁচটি মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাপান থেকে দুটি, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির একটি, আর সোভিয়েত দেশের দুটি। এই সব-কটি মহাকাশযানই উৎক্ষিপ্ত হয়ে এখন হ্যালির ধূমকেতুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে এইসব মহাকাশযান হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছাকাছি গিয়ে শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের আলোকচিত্র তুলবে, কেন্দ্রীয় অংশ যেসব গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত তাদের রাসায়নিক বিচার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করবে। আর এইসব দুর্লভ তথ্য মহাকাশযান আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবে, আমরা তখন হয়তো ধূমকেতু সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারব।

হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে ভারতও পিছিয়ে নেই। তামিলনাড়ুর কাভালুরে অবস্থিত ৪০ ইঞ্চি দূরবিন, অন্ধ্রপ্রদেশের রঙ্গাপুরে অবস্থিত ৪৮ ইঞ্চি দূরবিন এবং নৈনিতালে অবস্থিত ৪০ ইঞ্চি দূরবিন ভারত থেকে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। কলকাতার পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার তাঁদের দুটি দূরবিন খড়্গপুরের কাছে একটি গ্রামে বসাবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেখান থেকে এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন। এর প্রধান কারণ হল কলকাতার রাত্রিকালীন আলো, ধোঁয়া ও ধুলো দূরবিনের সাহায্যে আকাশের কোনও জ্যোতিষ্কের আলোকচিত্র গ্রহণ করার অন্তরায়।

এইসব মহাকাশযান পাঠিয়ে এবং পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে, আশা করা যায় যে ধূমকেতু নিয়ে অনেক অজানা প্রশ্নের সমাধান মিলবে। আর তোমরা বড় হয়ে ধূমকেতুর উৎপত্তি ও তার জীবনরহস্য সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে। তবে এখন নিশ্চয়ই তোমরা উৎসুক হয়ে থাকবে, কবে রাতের আকাশে তোমরা হ্যালির ধূমকেতুর মনোরম দৃশ্য দেখতে পাবে !

আমি ভূত

সুব্রত সেনগুপ্ত

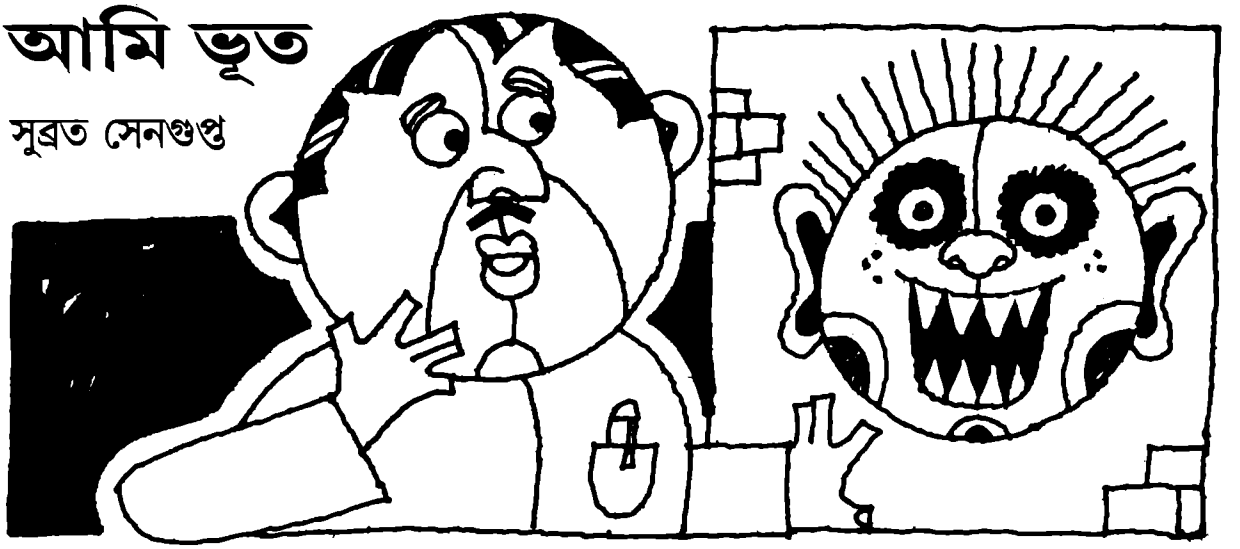

বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন সদানন্দবাবু। সারা গ্রামে তিনিই শুধু বি· এ· পাস করা লোক। তারপর হোমিওপ্যাথি করেন। ওষুধ দেন তিন রকম, বেলেডোনা, নাক্সভোম আর রাসটক্স। রোগও সারে। তাঁর মাটির বাড়ির ডিসপেনসারিতে দিনরাত লোক আসছে। এদের মধ্যে অনেকে রোগী। আবার অনেকে আসে নানা সমস্যা নিয়ে। সদানন্দবাবুর কাছে জানতে চায় কী করা উচিত, কী করলে ভাল হয়। হাজার হোক লেখাপড়াজানা মানুষ। তাঁর একটা বিবেচনা আছে, বিচারবুদ্ধি আছে। সদানন্দ হাসিমুখেই সবার কথা শোনেন, হাসিমুখেই উত্তর দেন। হাসি ছাড়া তাঁর মুখ কেউ দেখেছে কি না সন্দেহ। সদানন্দর সঙ্গে দুটো বস্তু সব সময়ই আছে। এক তো মুখের হাসি, আর দুই, তাঁর নামের সঙ্গে বি· এ·। যে-কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে, যে-কোনও কাগজে সই করতে হলে তিনি বি· এ· যোগ করতে কখনও ভোলেন না। বলতে গেলে তাঁর নামের মধ্যে এই দুটো অক্ষর ঢুকে গেছে—সদানন্দ বসু, বি· এ·।

একদিন সকালে সদানন্দ দেখলেন, তাঁর বাড়ির মাটির দেওয়ালে কে বা কারা একটা বিদঘুটে মুখ এঁকে রেখে গেছে। খাড়া-খাড়া চুল, গোল-গোল চোখ, যেন দাঁত কিড়মিড় করছে, ছবির নীচে লেখা : আমি ভূত। কার কাজ এটা ? সদানন্দ চোখ পাকিয়ে চারপাশে তাকালেন। কেউ নেই। সদানন্দবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর হাসি মিলিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে মুখের হাসি ফিরিয়ে আনলেন। বেছে বেছে তাঁর বাড়ির দেওয়ালেই এইসব কাণ্ড। এখানে এত লোক আসছে-যাচ্ছে। তারা সব এই ছবি দেখবে। বেশ তো,ছবি যদি আঁকতেই হয়, ভাল কিছু, গুরুগম্ভীর কিছু আঁকলে বা লিখলেই হত ? যেমন একটা ছেলে কোনও কাজ করছে। নীচে লেখা : সময় চলে যাচ্ছে বা কাজ ফেলে রেখো না— এই রকম আর কি। তা না, আমি ভূত ! সদানন্দের মুখ থেকে আবার হাসি মিলিয়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে তিনি আবার হাসি ফিরিয়ে আনেন। এখনই লোকজন আসতে শুরু করবে। সদানন্দকে শক্ত করে হাসি টেনে ধরে রাখতে হবে।

সেদিন দুপুরেই খেয়ে উঠে সদানন্দ ঠিক করলেন, ভূত নেই এটা তিনি প্রমাণ করে ছাড়বেন। দরকার হলে কিছুদিনের জন্য আর সব কাজ ছেড়ে দিতে হবে। আর এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য চাই সাহসী কিছু ছেলে। আর যেদিন প্রমাণ হবে ভূত নেই, সেদিনই এই ছবি তিনি মুছবেন। তার আগে নয়। শুধু ভেবে-ভেবে সময় কাটানোর লোক সদানন্দ নন। তাপস, নিখিল আর বলাইকে নিয়ে অভিযাত্রী দল তৈরি হল। দলের নেতা অবশ্যই সদানন্দ। দলের নাম নিয়ে একটু গোলমাল দেখা দিল। একজন বলল, ভূতবিরোধী সঙ্ঘ নাম রাখা হোক, আর একজনের প্রস্তাব—ভূতনাশ মোর্চা। কিন্তু দুটো নাম থেকেই মনে হয় ভূত বলে কিছু আছে। তাকে নাশ করা হবে বা রোখা হবে। তবে ? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা হল, নাম রাখা হবে : অবিশ্বাসী।

খবর শুনে গ্রামের পুরুতঠাকুর ছুটে এলেন। "এসব কী শুনছি মশাই, আপনারা কিছুই বিশ্বাস করেন না নাকি ?"

সদানন্দ বসু বি· এ· হাসিমুখে বললেন, "এসব কে বলল আপনাকে ? আমরা ভূত বিশ্বাস করি না।"

"ভূত বিশ্বাস করেন না !"

"আজ্ঞে না।"

"না। বলি, বর্তমানে বিশ্বাস করেন না, ভবিষ্যতে ? করেন কি করেন না ? যদি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ থাকে, ভূত থাকবে না কেন শুনি ?"

"আরে মশাই, সেই ভূত নয়। লোকে বলে না ভূত, যাতে ভয় পায়—"

"অ, তা তেনার পেছনে লাগতে গেছেন কেন ? তিনি যদি রুষ্ট হন ? তা ছাড়া, আপনারা আজ বলছেন ভূত নেই, কাল বলবেন ভগবান নেই, পরশু বলবেন ব্রাহ্মণ বলে কিছু হয় না, অ্যাঁ ?"

সদানন্দ বসু বি· এ·'র মুখ থেকে হাসি প্রায় ছুটে পালাতে চাইছিল। তিনি অনেক কষ্টে তাকে টেনে ধরে রাখলেন। পুরুতঠাকুর বললেন, "আমি বলে দিলাম ভূত আছে, ব্যস। বলুন কী বলবেন এবার। বাজি ধরবেন ?"

সদানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন, "বাজি ?"

"হ্যাঁ, বাজি। কী, রাজি? আপনি বলছেন নেই, আমি বলছি আছে।"

"কী বাজি ?"

"এই ধরুন আপনার নামের শেষের ওই বি· এ·। আপনি

হেরে গেলে টিকটিকির ন্যাজের মতো আপনার নাম থেকে ওটা খসে পড়বে। খসে আমার নামে যোগ হবে। আমি তখন লিখব, জলধর ভট্‌চাজ, বি· এ·।"

সদানন্দ বললেন, "সে কী করে হয়? আপনার নামের সঙ্গে—"

"কেন হয় না শুনি? আমার বাপ-মা-র দেওয়া নামটা কি খারাপ যে তার পাশে বি· এ··ফি· এ· শোভা পাবে না?"

"আহা, শোভার কথা নয়। ওটা লিখতে হলে পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তার আগে খাটাখাটনি, রাতজাগা, বই মুখস্থ, সে অনেক ব্যাপার।"

"দেখুন মশা', আমায় বই-মুখস্থ, পরীক্ষা-পাস, ওসব দেখাবেন না। পুরোহিতদর্পণ আমার কণ্ঠস্থ। তারপর কী বলে···ইয়ে···"

গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার অনাথবন্ধু সরকার এতক্ষণ বসে-বসে এঁদের বাক্যালাপ শুনছিলেন। তিনি এখন নড়েচড়ে বসে কেসো গলা পরিষ্কার করে বললেন, "দেখুন, কথাটা হচ্ছে, আপনি বলছেন ভূত নেই। এখন তর্কের খাতিরে ধরা গেল তারা নেই। প্রশ্ন হল, যা নেই তা তো নেই-ই। যা আছে তা প্রমাণ করা যায়। যা নেই, নেই এই ব্যাপারটা কী করে প্রমাণ করবেন? আপনি বলবেন, উত্তরে গিয়ে দেখলাম নেই। আমরা বলব, দক্ষিণে থাকতে পারে। আপনি দক্ষিণে গেলেন। আমরা পূর্ব, পশ্চিম দেখাব। আপনি তাও গেলেন। আমরা ভাবব এখন উত্তর বা দক্ষিণে নেই তার প্রমাণ কী? কিন্তু যেটা আছে, যেমন ধরুন গিয়ে বরফকল। আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বললেন, অ্যাই দ্যাখো। তোমরা বলছিলে নেই। এখন নিজের চোখে দেখে নাও। ব্যস প্রমাণ হয়ে গেল। অতএব—"

সদানন্দর মেয়ে রিঙ্কু তার মা'কে ভয়ে ভয়ে বলল, "মা, বাবা যে এসব করছে, ভূতদের যদি মন খারাপ হয়?"

'অবিশ্বাসীদের' কথা শুনে নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল। কিন্তু সদানন্দ বসু, বি· এ· অটল। ভূত নেই এটা প্রমাণ না করে তিনি বিশ্রাম নেবেন না। তিনজনকে নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। একজন-দুজন করে আরও লোক এগিয়ে আসতে লাগল। এ-রকম একজনের নাম ফেলু। তার উৎসাহ যেন সদানন্দর চাইতেও বেশি।"

শ্মশানের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সন্ধের পর একা-একা যেতে সবাই ভয় পায়। কেয়াতলার পোড়ো বাড়িটার ত্রিসীমানায় দিনের বেলায়ও কেউ যায় না। গ্রামের কাছেই নদী। সেই নদীর সতী-ডোবা ঘাটে রাতের দিকে যেতে লোকের বুক কাঁপে। গ্রামের প্রান্তে যে বাঁশবন, তার কথা শুনলেই বাচ্চারা ভয়ে কেঁপে ওঠে। সদানন্দর দল বেছে-বেছে এ-সমস্ত জায়গায় হানা দিতে লাগল। সারা গাঁয়ে হই-হই পড়ে গেল। কেউ ভাবল, ভূতরা এবার আস্তানা ছেড়ে পালাবে। আবার কেউ ভয় পেল, ভূতরা রেগেমেগে লোকালয়ের দিকে তেড়ে আসবে।

গাঁয়ের সবার বড়মা নিভাননী চমৎকার ভূতের গল্প বলতে পারেন। বিকেলে খেলাধুলোর পর বাচ্চারা তাঁকে ঘিরে ধরে। গল্প শুনতে চায়। নিভাননী ভাবেন, সত্যি যদি ভূত না থাকে, সদানন্দর দল যদি প্রমাণ করে দেয়, ভূতটুত বাজে, তা হলে আর কি কেউ তাঁর গল্প শুনতে চাইবে? বাচ্চারা কি আর গল্প বলো গল্প বলো বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরবে? ওদের গল্প শোনার মজা আর তাঁর গল্প বলার সুখটুকু এরা কেড়ে নিতে চাইছে কেন? থাক না ভূতরা ভূতেদের মতো। তারা মিথ্যে হলেই বা ক্ষতি কী?

নিভাননীর রোজকার এক শ্রোতা, বয়সে একটু বড়, রতন ভেবে পায় না, ভূত নেই জানা গেলে গল্পের ভূতগুলোর কী দশা হবে?

রতনের বাবা পাঁচকড়ি সেদিন কী কাজে পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলেন। রাতে ফেরার সময় তিনি দেখতে পেলেন, মুখুজ্জেদের বাগানে ঢ্যাঙামতো কে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বিরাট ঘোমটা। ঘোমটা অল্প অল্প দুলছে। দেখে তো তাঁর সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে। কোনওরকমে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। বুক তাঁর ধ্বক-ধ্বক করছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে ব্যাপারটা তিনি বাড়ির লোকের কাছে বললেন। খবর গেল সদানন্দর দলের কাছে। সদানন্দ সঙ্গে-সঙ্গে ফেলুকে নিয়ে ছুটলেন। তাঁর এক হাতে একটা বড় টর্চ, অন্য হাতে ছোট লাঠি একটা। গিয়ে দেখেন সত্যি কে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "ক্যা র‍্যা?"

চিৎকার শুনে ঘোমটা-পরা হঠাৎ ছুটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সদানন্দবাবু হেসে উঠলেন, "কী রকম ভিতু ভূত দেখ। মানুষের গলা শুনে পালায়!"

এদিকে সেই ভিতু ভূত তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সদানন্দ ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলেন। টানাটানিতে ঘোমটা খসে যেতে এ কী! এ যে সেই নিভাননী!

সদানন্দ বললেন, "ছিঃ।"

ফেলু বলল, "ছিঃ, ছিঃ।"

নিভাননী ছুটে পালালেন। ফেলু হঠাৎ বলল, "ওই দেখুন।"

সদানন্দ দেখলেন, বাগানের অন্যদিকে ঢ্যাঙামতো কে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বিরাট ঘোমটা। সে অল্প-অল্প দুলছে। সদানন্দ টর্চ ফেললেন, ও হরি! ঘোমটা নয়, কিছু নয়। লম্বা কলাগাছ একটা। ঝুঁকে পড়া একটা বড় পাতা বাতাসে অল্প-অল্প দুলছে। সদানন্দ হো-হো করে হেসে উঠলেন। এই সময় ফেলু তার পেছন থেকে বলে উঠল, "এই দেখুন।"

সদানন্দ দেখলেন, আবার ঢ্যাঙামতো কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তেমনি ঘোমটা। তেমনি দুলছে। সদানন্দ আগের মতোই এগিয়ে গিয়ে টর্চ ফেললেন। সত্যি কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাঁক দিলেন, "কে?"

কোনও উত্তর নেই। সদানন্দ খোঁচা দিতে লাঠি তুললেন। কিন্তু ঢ্যাঙামতো সে একটু সরে গেল। সদানন্দ লাঠি হাতে এগিয়ে গেলেন। সেও সরে গেল। এরকম বার বার। প্রতিবারই সে সরছে, কিন্তু বেশি দূরে নয়। ঠিক সদানন্দের নাগালের বাইরে। তারপর একবার লাঠি বাড়াতেই লাঠিটা যেন বিদ্যুৎ-গতিতে সদানন্দর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল বুঝতে না পেরে সদানন্দ টর্চ জ্বালালেন। শূন্যে ঝুলছে লাঠি। কী হচ্ছে এসব? সদানন্দর হাত থেকে কে লাঠি ছিনিয়ে নিল? আর ঘোমটা-পরা ওটাই বা কে দাঁড়িয়ে আছে? সদানন্দ চারপাশে তাকালেন। এতক্ষণে খেয়াল হল, ফেলুকে অনেকক্ষণ দেখেননি। কোথায় গেল

সে ? সদানন্দ চিৎকার করে ডাকতে গেলেন। কিন্তু তাঁর গলা থেকে আওয়াজ বার হল না। এ কী ? সদানন্দ কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ? না, না, ভয় পেলে চলবে না। এদিকে সদানন্দর দলের আরও লোকজন দেরিতে খবর পেয়ে সেখানে এসে হাজির। তাদের হাতেও টর্চ, তাদের হাতেও লাঠি। তারা জিজ্ঞেস করল, "কী দাদা, কী খবর ?"

সদানন্দ কোনওরকমে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "হই যে—"

তখনই কী একটা ঠক করে সদানন্দর পায়ের কাছে পড়ল। একজন টর্চ জ্বেলে বলল, "আরে আপনার লাঠিটা এখানে পড়ে আছে। আর এটা, এটা তো কলাগাছ।"

অ্যাঁ, কলাগাছ ! সদানন্দ মনে মনে বললেন, তিনি যে স্পষ্ট দেখলেন ? তা ছাড়া গাছ কি সরে যেতে পারে, না লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে পারে ? লোকগুলো বলল, "চলুন, যাওয়া যাক, কিন্তু ফেলু কোথায় গেল ?"

"এই যে আমি," বলে ফেলু এসে উপস্থিত হল। "বড্ড ভয় পেয়েছিলুম গো।"

"ও, তুই দেখছি ভিতুর ডিম !"

"না গো, পালাতে গিয়ে শুনলুম, দুটো লোক বলাবলি করছে, কেয়াতলার পোড়োবাড়িতে ভূত দেখা গেছে। তাই তোমাদের বলতে এলুম।"

তখনই সবাই ছুটল কেয়াতলার দিকে। সদানন্দবাবুও অবশ্যই চললেন। তবে তিনি অন্যদের মতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছেন না। হঠাৎ মনে হল, তাঁর পাশে পাশে কে চলেছে। টর্চ ফেললেন। আশ্চর্য, টর্চের আলো লোকটার শরীর ভেদ করে চলে গেল ! যেন কাঁচের ওপর আলো পড়েছে। লোকটার মুখটা যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার। সদানন্দ "কে ?" বলে চিৎকার করে উঠতে অন্যরা পেছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই জমাটবাঁধা অন্ধকার ফেলুর মুখ হয়ে গেল। সদানন্দ বুঝতে পারছেন, এই লোকটা ফেলু নয়। অথবা ফেলু কোনও লোক নয়। কিন্তু একথা অন্যদের বললে বিশ্বাস করবে না। উলটে ভাববে, সদানন্দ বসু, বি· এ· আসলে ভিতু সম্প্রদায়ের। বড়াই করে অনেক কিছু বলেন বটে। কিন্তু এ ব্যাটা তাঁকেই ভয় দেখানোর জন্য বেছে নিয়েছে কেন ? অন্য কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না। শুধু তাঁকে জানিয়ে যাচ্ছে, সে রীতিমত আছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন শূন্যে লাঠি ভাসছে, বিরাট ঘোমটা দিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্যরা উপস্থিত হতেই লাঠি মাটিতে নেমে পড়ছে। ঘোমটা কলাগাছের পাতা হয়ে যাচ্ছে। নিরেট অন্ধকার ফেলুর মুখ হয়ে উঠছে।

একই ঘটনা আবার ঘটল। চামচিকে-ইঁদুরে ভর্তি পোড়োবাড়িতে সবাই টর্চ হাতে ঘুরছে। সদানন্দ চলাফেরা করছেন সাবধানে। তেমন কিছু দেখলেই লাঠিটা জোরে ছুঁড়ে মারবেন। হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন ফেলু দাঁত বার করে হাসছে। টর্চের আলো তেমনি তার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে। সদানন্দ সজোরে ছুঁড়ে মারলেন হাতের লাঠি। যেন হাওয়া কেটে লাঠিটা চলে গেল। ফেলু তখনও হাসছে। হাসতে হাসতেই তার মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল এবং অন্ধকারটা ফেলু হয়ে উঠল। এদিকে লাঠি দেওয়ালে গিয়ে লাগার শব্দ শুনে অন্যরা এদিকে ছুটে আসছে। দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই ফেলু সদানন্দর চোখের সামনে একটা পুরনো আলমারি হয়ে গেল।

এর পর আবার খবর পেয়ে 'অবিশ্বাসী' দল সতী-ডোবা ঘাটে ছুটল। ছলছল করছে নদীর জল। আবার ফেলু। সদানন্দ দেখলেন, কিন্তু আর কারও চোখে পড়ার আগেই ফেলু একটা নৌকো হয়ে অন্ধকার জলে ভাসতে লাগল।

সদানন্দ বললেন, তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। তিনি বাড়ি যাবেন। কিন্তু বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই। সদানন্দ একটা চেয়ারে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন কী করা যায়। হঠাৎ চেয়ারটা নড়ে উঠল। চেয়ার উঠে দাঁড়াচ্ছে ! মাটিতে পড়ে গিয়ে সদানন্দ দেখলেন, ফেলু দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় সদানন্দর বউ এক গ্লাস দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ফেলু একটা বেড়াল হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সদানন্দ সারা রাত ঘুমোতে পারেননি। তাঁকে ভূতে পেয়েছে শুনলে বউ মেয়ে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। কাজেই তাদের কিছু বলা যাবে না। অন্যদেরও না। কী করবেন তিনি ? ফেলু কী চায় ? তিনি যদি অবিশ্বাসী-দল ভেঙে দেন, তবে কি সে তাঁকে রেহাই দেবে ? এসব ভাবতে-ভাবতে শেষ রাতে তন্দ্রার মতো এসেছিল। হঠাৎ গোলমালে তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। কারা চেঁচাচ্ছে—সদানন্দর জয়। অবিশ্বাসী'র জয়। কী ব্যাপার ? ভূত নেই এটা প্রমাণ করার জন্য সদানন্দকে কারা সংবর্ধনা জানাতে চায়। তারা বলছে, সদানন্দবাবু এত বড় একটা কাজ করেছেন, তার জন্য কিছু না করলে ভারী অন্যায় হবে।

খবর শুনে সদানন্দবাবুর স্ত্রী খুশি, মেয়েও খুশি। কিন্তু তিনি কেঁপে-কেঁপে উঠছেন। তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। লোকগুলোর সামনে গিয়ে দেখলেন, এদের কাউকে তিনি চেনেন না। এরা সব এল কোথা থেকে ? আর এই ভোরে, ভাল করে এখনও আলো ফোটেনি, এই সময় সংবর্ধনা দিতে আসা !

সদানন্দ রাজি নন। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। গান শুরু হয়ে গেল। তার সঙ্গে নাচ। এবং নাচ-গানের মধ্যেই বক্তৃতা। কী হচ্ছে এ-সমস্ত। কিন্তু সদানন্দর বিস্মিত হওয়ার পালা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ তিনি লক্ষ করলেন, আলো যত স্পষ্ট হচ্ছে, সংবর্ধনা দিতে আসা লোকগুলো ততই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে লোকগুলো যেন রোদের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। সদানন্দ, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শব্দ নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হচ্ছে কারা দাপাদাপি করছে। লাফাচ্ছে। নাচছে। এর মধ্যে ফেলু এসে দাঁড়াল। তার শরীর এখন স্বচ্ছ। শরীরের মধ্য দিয়ে শরীরের ওপাশের সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

এর মধ্যে অবিশ্বাসী দলের ছেলেরা হই-হই করতে করতে সদানন্দ বসুর বাড়ি আসছে। তাদের গলার শব্দ, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্য মানুষের সাড়া পেয়ে সদানন্দের স্ত্রী যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কে, তুমি কে ?"

ফেলু উত্তর না দিয়ে বাড়ির দরজার দিকে তাকাল, তারপর এক লাফে গিয়ে পৌঁছল সেই দেওয়ালটার সামনে, যেটায় একটা ভূতের মুখ আঁকা। সুড়ুত করে সে ছবিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল, যে-ছবির নীচে লেখা : আমি ভূত।

ছবি : দেবাশিস দেব

ওর দাঁতকে এখন থেকেই সুরক্ষিত করে নিন

এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ ওকে বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন

দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন আর, বিনাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয় ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।

তাই বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।

দাঁতে নব জীবনের সাড়া

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-HCG-BF-10-85-BENG

চাঁপাফুলের গন্ধ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বব গ্রেগরির বলটাকে স্কোয়ার কাট করে বাউন্ডারিতে পাঠাবার পরেই আমি বুঝতে পারলাম, গাওস্করের তেত্রিশটা টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আমি আজ ধরব। সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মুখটাও আমার মনে পড়ল। আমি টেস্ট টিমে ঢোকবার আগেই আমার বাবা মারা যান। আমার বয়স তখন সতেরো। এখন আমার ৩৩ বছর ৮ মাস ১৭ দিন। এগুলো খুব দরকারি তথ্য। আজ যদি সেঞ্চুরি করি, কাল কত ভাষ্যকার কত কী লিখবে। আগের সেঞ্চুরিটার পর থেকেই তো আরম্ভ হয়েছে, গাওস্কর আমার চেয়ে বড় কি ছোট। অদ্ভুত লোকগুলো। আমার গুরু গাওস্কর। আজ যদি তেত্রিশতম সেঞ্চুরিটা হয়, তা হলে কাউকে যা বলিনি, সেটা করব। আমি অবসর নেব। রেকর্ড-বুকে আমার আর গাওস্করের নাম পাশাপাশি থাকবে। গুরু আর শিষ্য। একলব্য শিষ্য। গাওস্করের এখন পঁচাত্তরের ওপর বয়স। তবুও একদম সটান মানুষ।

ইডেনের বিরাট স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে আমার নামের পাশে আমার রান, ৬০ নট আউট। অন্যদিকে ব্যাট করছে আন্দামানের ছেলে রাকেশ পিটার। একটু আগে ইনিংসের গোড়াপত্তন হয়েছিল খুব ভাল। জম্মু কাশ্মীরের গোলাম রসুল আর উত্তরপ্রদেশের বিনয় দুবে দারুণ খেলে ১০১ রান তোলে। তারপরই এই সাত ফুট লম্বা বব ইংল্যান্ডের হয়ে তৃতীয়বার বল করতে এসে দু' ওভারে চারটে উইকেট নেয়। বিনয় প্রথম আউট হয়। আমি নামলাম। প্রথম বলেই একটা বাই রান পেলাম। গোলাম আউট হল। পরের ওভারে আমি চারটে রান পেলাম। দু'বার দুই-দুই করে। আবার বব বল করতে এল। পর-পর দু'বলে আউট হল গোয়ার ফেলিক্স কারনিরেও আর কেরলের সি· এন· জন। দুজনেই দারুণ ফর্মে ছিল। কিন্তু আজ বব দারুণ বল করেছে। ছিলাম বিনা উইকেটে ১০১, হলাম চার উইকেটে ১০৬। রাকেশ পিটারের এটাই প্রথম টেস্ট ম্যাচ। বেচারি। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, "তোমার খেলা আমি রনজি আর দলিপ ট্রফিতে দেখেছি, তুমি বড় খেলোয়াড় হবে। আজ তুমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সোজা ব্যাটে খেলবে। সাহস করে ববের সামনে দাঁড়াও, কিচ্ছু ভয় নেই। আমি আর তুমি ভারতের ইনিংস দাঁড় করিয়ে দেব।" রাকেশ নিশ্চয় সাহস পেয়েছিল। ববের বাকি দুটি বল একদম ব্যাটের মধ্যিখানে নিয়ে খেলল। কিন্তু ইংল্যান্ডের আসল লক্ষ্য আমি। আমাকে সরাতে পারলেই ওদের মতলব হাসিল হবে।

কী জোর লড়াই হল! গ্রেগরি, গারুফি, স্মিথসন তিনজন ফাস্ট বোলার, আর ছোবলমারা বল-দেনেওয়ালা কিচিন তাদের প্রাণপণ চেষ্টা করল। আর সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা কী ফিল্ডিংই না করল! আমার নিশ্চিত চারগুলোতে হয় রান হল না, নয় দুটো করে রান হল। ওদিকে রাকেশও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতো খেলছে, ওর রানও হয়েছে ৫০। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ও আর আমি সমান যাচ্ছিলাম।

আমাদের রান এখন ২৩১। গারুফি অনেকগুলো নো-বল করেছে। গ্রেগরির এই ওভারে দশ রান নেবার পর আমি বুঝলাম, আজ আমার দিন।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মুখ মনে পড়ল। আমাদের বংশ অধ্যাপকের বংশ। কত পুরুষ, তা জানি না। তবে সবাই বাঘা-বাঘা অধ্যাপক। তাদের নামে লোকে এখন মাথা নোয়ায়। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে আমি পড়াশোনা ভালবাসতাম না। রাজ্য সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষাসূচি শেষ হতেই আমি পড়াশোনা ছাড়লাম। এখন আমি শুধু ক্রিকেট খেলব। বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। রোগা লম্বা মানুষটা দেখতে ভারী সুন্দর ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, সকলের ভাল লাগত। অত শান্ত মানুষটিরও কিন্তু থুতনিতে একটা বিরাট কাটার দাগ ছিল। মজা এমনি যে, ওই কাটা দাগেও ওঁকে ভাল দেখাত। সেদিনটার কথা মনে আছে। বাবা তাঁর অঞ্জলি ভরে চাঁপাফুল এনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি চাঁপাফুল ভালবাসি বলে বাবা প্রায় সারা বছর ধরেই আমার জন্যে চাঁপাফুল আনতেন। কোথায় একটা বারোমেসে গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখনই আমি হাতে ব্যাট নিয়ে বেরোচ্ছি। বাবা অবাক হয়ে বললেন, "তুই কলেজ যাবি না?" বাবাকে আমি বললাম, "না। আমি পড়া ছেড়ে দিলাম। নিউ স্টার আমায় ভাল একটা শর্তে খেলতে দিচ্ছে। হাতখরচা পাব। তা ছাড়া ক্রিকেটে এখন অনেক পয়সা। ভাল খেলতে পারলে প্রোফেসারির

জগৎ জোড়া সিবিটির বইএর মেলা উপহারে-অন্যতম...

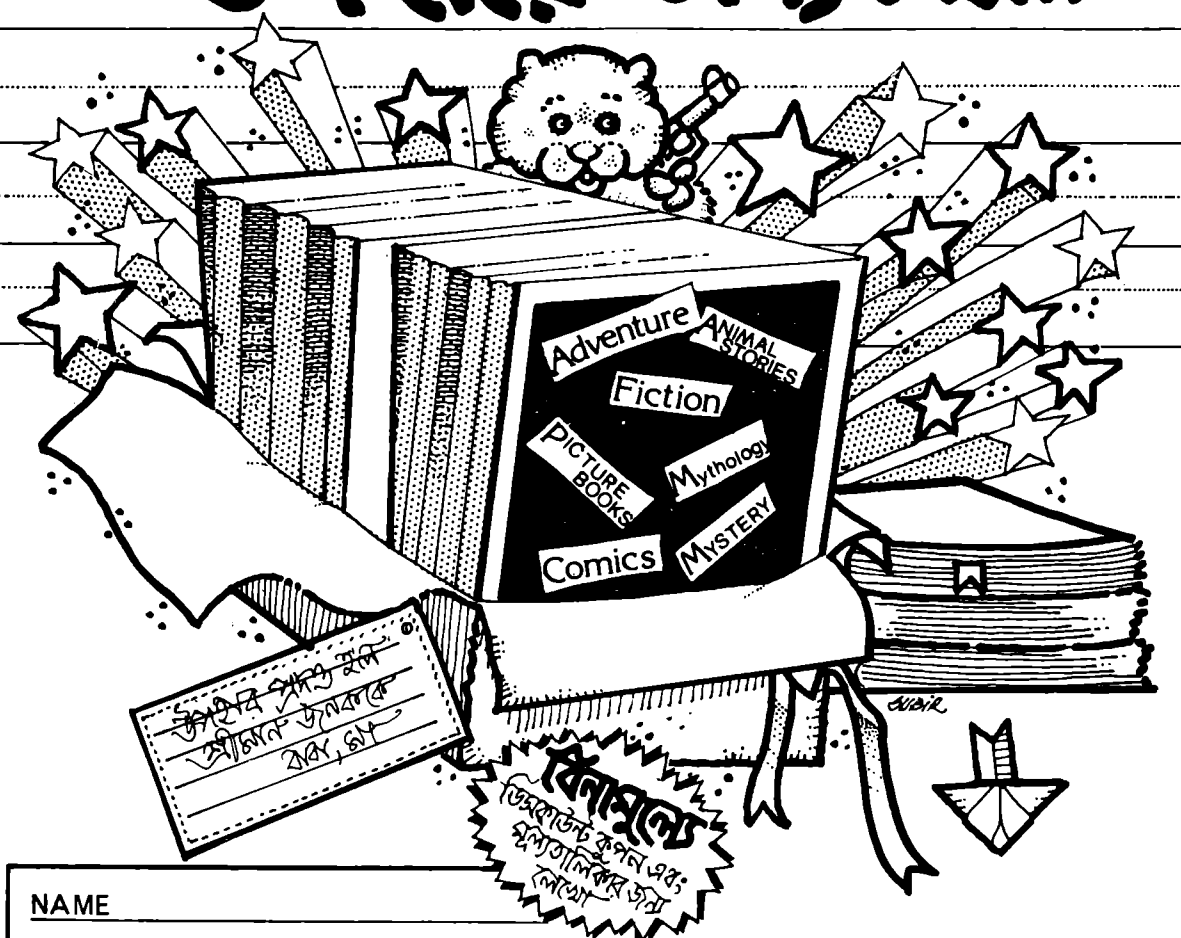

NAME

ADDRESS

BEAUTEX

CHILDREN'S BOOK TRUST
Nehru House,
4 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002

চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাব।"

বাবার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললেন, "খেলার মাঠেও একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিত লোককে খুব সহজেই আলাদা করা যায়। কোনও অশিক্ষিত লোককে দেশের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব কেউ দেয় না।"

সেই আমার সঙ্গে বাবার শেষ কথা। শেষ দেখাও বটে। ডাক্তার ডাকার সময়ও বাবা দেননি। আমার ওপর অভিমান করে চলে গেলেন।

চায়ের সময় হয়ে এল। আমি একটিবার ভাবলাম, আমি কি একটু আস্তে খেলব। বড় স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে—আমার রান ৭৮। আর ২২ রান, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার আর গাওস্করের নাম পাশাপাশি হবে।

রাকেশও দারুণ খেলছে। একবার ওভারের মধ্যে ও বললে, "ক্যাপ্টেন, তুমি একটু জোরে খেলছ। একটু ধীরে খেললে তুমি সেঞ্চুরি পাবেই।"

আমি ওর পিঠের মধ্যে একটা থাবা মেরে বললাম, "আমি তো পাবই, তুমিও পাবে।"

রাকেশ ভীষণ খুশি হয়ে গেল। তার ফলে কি না জানি না, চায়ের ঠিক আগের ওভারটা কিচিনকে পেটাল দেখবার মতো। আগের ওভারে আমিই বরং চুপচাপ ছিলাম। ৮৪ থেকে ৮৮তে উঠেছি। বাকি ১২ রান পরে হবে। রাকেশ তখন ৫৬। অনেক ঠাণ্ডা মাথায় খেলছে। গত বছর রনজি ট্রফিতে আমরা বোম্বাইয়ের অনেক দিনের রেকর্ড ভেঙেছি। ফাইনালে হারাই আন্দামানকে। এই রাকেশ দারুণ ব্যাট করেছিল। আমার বলকেই এগিয়ে এসে ছয় মেরেছিল। সারা পৃথিবীতে খুব বেশি ব্যাটস্‌ম্যান এ-কাজ করার সাহস দেখাবে না। সেই খেলা দেখাল। কিচিন বহু যুদ্ধের নায়ক। অনেক উইকেট পেয়েছে, অনেক মার খেয়েছে। কিন্তু প্রথম টেস্ট খেলছে এমন ছেলে ওর এক ওভারে ৬, ৬, ৪, ৪, ৬, ৪ মোট ৩০ রান নেবে, তাও চায়ের আগের ওভারে, কিচিন ভাবেনি। চার উইকেটে ২৯৪। পঞ্চম উইকেটে আমরা জুড়েছি ১৮৮ রান। পিটার ৮৬ আমি ৮৮ রানে চা খেতে গেলাম। ইডেনের বিশ্বনাথ ব্লক আমাদের প্রতিটি হাঁটার সঙ্গে-সঙ্গে বিউগল বাজাল। আমি রাকেশকে বললাম, "তুমি এগোও। শেষ ওভারটা অনবদ্য।"

চা খেতে মন চাইছিল না। শুনলাম গাওস্কর, আজহারউদ্দিন, বেদী, তিন বৃদ্ধই টেলিফোন করেছিলেন। আমি তখনও বাবার কথা ভাবছি। কী অন্যায়! যে মরে যায়, তার সঙ্গে কেন আর কথা বলা যায় না? নইলে বলতাম বাবাকে, আমি পড়াশোনা করেছি। খুব মন দিয়ে করেছি। আজ যদি আমায় দেখতে, তুমি খুশি হতে বাবা। তুমি সত্যি বলেছিলে, প্রথম দিকে আমাকে লোকে ঠাট্টা করত। বলত, আমি ভাল খেলি, কিন্তু আসলে চাষা। তারপর সব বদলে গেল। আমি বদলে গেলাম। রাতের পর রাত জেগে পড়েছি। নিজেকে তৈরি করেছি। বাবা, তুমি কিছু দেখতে পাওনি। আজ আমি সারা ভারতে শুধু নয়, সারা বিশ্বে পরিচিত। শুধু ভাল ব্যাটস্‌ম্যান বলে নয়, ভাল বোলার বলে নয়, মার্জিত ভদ্রলোক বলেও। ভারতের টিম আদর্শ টিম। খেলার মাঠে, খেলার বাইরে। আমি টিমের ক্যাপ্টেন হবার পর ভারতের কোনও খেলোয়াড় কোনও বাজে আবেদন করেনি। কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখনও আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। এখন বলো, আমি কি একজন ভাল অধ্যাপকের সমান হইনি?

আবার মাঠে খেলা। বিশ্বনাথ-ব্লক বোধহয় চায়ের বিরতির সময় একদম ওঠেনি। রক্ত-খাওয়া বাঘের মতো হয়ে আছে। আমার তখন মন খুব শান্ত। পিটারকে দেখতে হবে। প্রথম ওভারে একটা লেটকাট করলাম স্মিথসনকে। উইকেটকিপার হাঁ করে বলের চলে যাওয়া দেখল। ৯২। পরের ওভারে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন ডিক বার্ট নিজে বল করতে এল। ও এমনিতে বল করে না, কিন্তু চেঞ্জ বোলার হিসেবে ভাল। রাকেশকে আমি দেখেশুনে খেলতে বলেছিলাম। তাই তিনটে মাত্র চার নিল। সব কটা বোলারের পাশ দিয়ে। মাঠে কী হচ্ছে বোঝানো যাবে না। পিটার ৯৮। এর পরের ওভারেও আমি দু'বার দুই-দুই রান নিলাম। আমি ৯৬। মাঠ ফেটে পড়ছে। রাকেশ কিন্তু আমাকে অবাক করে দিল। প্রথম বলে ডিপ থার্ড ম্যানে বল পাঠিয়ে দৌড় শুরু করল। ওর সেঞ্চুরি নিশ্চিত। কিন্তু একটা রান নিয়েই চেঁচাল, নো। তারপর আম্পায়ারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, সেঞ্চুরিটা আগে তুমি করো।"

সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে। আমি বললাম, "ঠিক আছে, কিন্তু রাকেশ, ক্রিকেটে আর কখনও পাওয়া-রান ছাড়বে না। দলের ক্ষতি।"

রাকেশ বলল, "জানি, কিন্তু আজ রাগ কোরো না।"

সবাই বুঝেছে, রাকেশ কী করেছে। আমার চোখের সামনে একজন নতুন জনপ্রিয় তারকাকে জন্ম নিতে দেখলাম। পরের বলটা কী করে এল, কী করে খেললাম কিচ্ছু মনে নেই, শুধু চিৎকারই শুনলাম। আমি ৩৫ নম্বর সেঞ্চুরি করেছি। রাকেশ দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "আই ওয়াজ দেয়ার হোয়েন ইউ স্কোরড্ ইয়োর থার্টিফিফ্‌থ সেঞ্চুরি!" ডিক আর তার দল একে-একে এসে করমর্দন করল। আমার মাথাটা ভোঁভোঁ করছিল। তারপরই আবার বিস্ফোরণ। রাকেশ সেঞ্চুরি করেছে। প্রথম ইনিংসে ১০০ রানের এগিয়ে থাকার সুবাদে আমরা মোটমাট ৪২৪ রানে এগিয়ে গেলাম। এখন ইংল্যান্ডকে আউট করার পালা। রাকেশকে নিয়ে আমি ক্লাবহাউসের দিকে পা বাড়ালাম। আজ দুটো উইকেট চাই।

দিনের খেলার শেষে কী যে হল, আর কী যে হল না, বলতে পারব না। সারা কলকাতা ময়দানে এসে হাজির হয়েছে। চারদিকে মালা আর মালা। আর বাজি পুড়ছে। যেন কালীপুজোর রাত। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল। দরজা খুলে দিল আমার ছেলে। ও ক্রিকেটে একদম মজা পায় না। কিন্তু তাও খুব খুশি। বাড়ির সামনেও তখন ছেলেরা নাচছে।

হঠাৎ মনে হল, চাঁপাফুলের গন্ধে ম'ম' করছে আমার ঘর। বাবার পরে আর কেউ আমার জন্যে চাঁপা আনেনি। প্রশ্ন করলাম, "চাঁপাফুল কোথা থেকে এল রে?"

ছেলে বলল, "একজন বুড়োমতন লোক এসে তোমাকে দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের না থুতনিতে একটা বিরাট কাটা দাগ।"

ফুলগুলো আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এবারও বাবাকে দেখতে পেলাম না।

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

টিনটিন

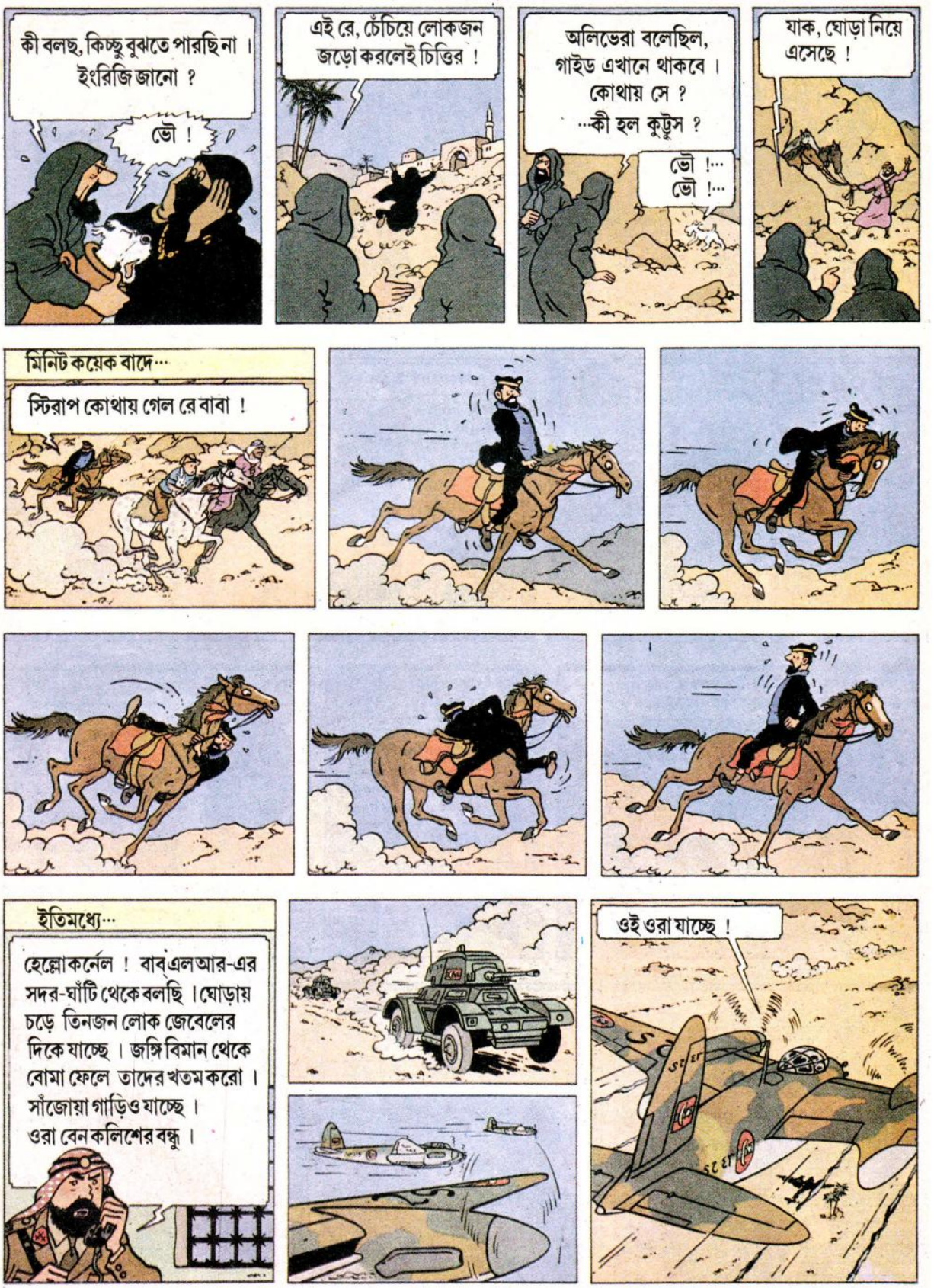
কী বলছ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ইংরিজি জানো ?
ভৌ !
এই রে, চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করলেই চিত্তির !
অলিভেরা বলেছিল, গাইড এখানে থাকবে। কোথায় সে ? ...কী হল কুট্টুস ?
ভৌ !... ভৌ !...
যাক, ঘোড়া নিয়ে এসেছে !
মিনিট কয়েক বাদে...
স্টিরাপ কোথায় গেল রে বাবা !
ইতিমধ্যে...
হেল্লো কর্নেল ! বাব্‌এল আর-এর সদর-ঘাঁটি থেকে বলছি। ঘোড়ায় চড়ে তিনজন লোক জেবেলের দিকে যাচ্ছে। জঙ্গি বিমান থেকে বোমা ফেলে তাদের খতম করো। সাঁজোয়া গাড়িও যাচ্ছে। ওরা বেন কলিশের বন্ধু।
ওই ওরা যাচ্ছে !

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক (আপাতত তার নাম পঞ্চানন্দ) জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে ; আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চকসাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে অতি-মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। চকসাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চকসাহেবের বাড়ির দিকে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে আক্রমণ করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা বিদ্যুতের অদৃশ্য বেড়ার মধ্যে আটকে রেখেছে। বাধাটা অপসৃত হয়েছে বুঝে মধ্যরাতে গজ নিঃশব্দে এগোয়। তারপর ···

গজ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখল, যা ভেবেছে তাই। সামনে কুয়াশা আর অন্ধকারেও জলাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। এ সেই রাজবাড়ির ঢিবিই বটে! সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে গজ একটুক্ষণ পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিল। এখন ইচ্ছে করলেই সে পালাতে পারে।

কিন্তু পালানোর আগে গুহাটা একটু দেখে নেওয়া দরকার। এরা কারা, কী চায় বা কী অপকর্ম করছে তা না জেনে পালিয়ে গেলে চিরকাল আপশোস থাকবে।

ধরা পড়লে কী হবে, তা গজ'র মাথায় এল না। সাহসী লোকেরা আগাম বিপদের কথা ভাবে না, হাতে যে কাজটা রয়েছে সেটার কথাই ভাবে।

গজ ফের সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে দেখল বাঁ ধারে আর ডান ধারে দুটো পথ গেছে। বাঁ ধারে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ওদিকে বিশেষ কিছু নেই। ডান ধারের পথটা একটুখানি গিয়েই বাঁক খেয়েছে।

সে-পথে হাঁটতে গজর কোনও অসুবিধে হল না, কারণ মাথার ওপর একটু দূরে দূরে সেই আলো-পাথর ঝোলানো। এরকম আশ্চর্য পাথর পৃথিবীর লোক চোখেও দ্যাখেনি। গজ প্রত্যেকটা পাথরই ছুঁয়ে দেখল। ঠাণ্ডা, নেড়ে দেখল, সেগুলো বজ্র-আঁটুনিতে আটকানো রয়েছে। খোলার উপায় নেই।

সুড়ঙ্গটা ক্রমে চওড়া হচ্ছিল আর নীচে নেমে যাচ্ছিল। যখন শেষ হল, তখন গজ দেখল বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর, একসময়ে যে ঘরখানা রাজবাড়ির ঘর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শ্বেতপাথরের মেঝে, কারুকার্য-করা পাথরের দেয়াল। ঘরে অবশ্য রাজকীয় কোনও জিনিসপত্র নেই। আছে নানারকম বিদঘুটে যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতি কস্মিনকালেও দ্যাখেনি গজ। সে হাঁ করে দেখতে লাগল।

হঠাৎ পায়ে কুট করে কী একটা কামড়াল গজকে।

একটু চমকে উঠে গজ চেয়ে দেখল, সবুজ রঙের একটা কাঁকড়াবিছে।

কাঁকড়াবিছের হুল সাংঘাতিক, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়। তেমন-তেমন কাঁকড়াবিছের হুলে মানুষ মরেও যায়। তাই গজ ভীষণ আতঙ্কিত চোখে বিছেটার দিকে চেয়ে রইল।

হুল দিয়েই বিছেটা গুড়গুড় করে হেঁটে গিয়ে একটা ইঁদুরধরা বাক্সের মতো ছোট বাক্সের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। দরজাটা ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

গজ বসে পড়ে তার বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা দেখল। কোনও ক্ষত নেই, ব্যথা বা জ্বালাও সে টের পাচ্ছে না। কিন্তু ভারী সুন্দর একটা গন্ধ মাদকের মতো তার নাকে এসে লাগল আর শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল, ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল চোখ।

অন্য কেউ হলে ঢলে পড়ত, কিন্তু গজ'র শরীরে এবং মনে অসম্ভব শক্তি। সে প্রাণপণে মাথা ঠিক রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুটো ভারী পা ফেলে ফেলে বাইরের দিকে দৌড়তে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল, অজ্ঞান হয়ে এখানে পড়ে থাকলে সে আবার দানোদের হাতে ধরা পড়ে যাবে।

এরকম আশ্চর্য মাতাল-করা সুগন্ধ আর এমন মনোরম ঘুমের অনুভূতি কখনও হয়নি গজ'র। সে চোখে নানা রঙের রামধনু দেখছিল। তার খুব হাসতে ইচ্ছে করছিল, গান গাইতে ইচ্ছে করছিল, নাচতে ইচ্ছে করছিল।

কাঁকড়াবিছের বিষে এমনটা হওয়ার কথা নয়। রহস্য হল, এই বিছেটা সবুজ। পৃথিবীতে গজ যতদূর জানে, সবুজ রঙের কাঁকড়াবিছে হয় না। এই অদ্ভুত বিছেটার বিষও যে অভিনব হবে তাতে আর বিচিত্র কী?

গজ প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। কিন্তু সে যাকে দৌড় বলে মনে করছিল তা আসলে হাঁটি-হাঁটি পা-পা। কিন্তু তবু গজ তার ঘুমে ভারাক্রান্ত শরীরটাকে একটা ভারী বস্তার মতো টেনে-টেনে এগোতে লাগল। থামল না।

কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখটা অনেক দূর এবং চড়াই ভাঙতে হচ্ছে বলে গজ বেশিদূর এগোতে পারল না। শরীর ক্রমে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। আর বেশিক্ষণ গজ এই ঘুম-রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারবে না।

ভাগ্যবলেই গজ বাঁ দিকে একটা গর্ত দেখতে পেল। খুব আবছা দেখা যাচ্ছিল।

গজ প্রাণপণে গর্তটার দিকে এগোতে লাগল। খুবই সংকীর্ণ গর্তটা। একটু উঁচুতেও বটে। কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে গজ অতি কষ্টে গর্তটার কানা ধরে উঠে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগোতেই একটা ভীষণ ঢালু বেয়ে সে গড়িয়ে পড়ে গেল।

পতনটা আটকানোর কোনও উপায় বা শক্তি গজ'র ছিল

না। ভারী শরীরটা গড়াতে-গড়াতে কতদূর যে নেমে গেল গজ তার হিসেব করতে পারল না। তারপর হঠাৎ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হল সে।

ঝপাং, একটা শব্দ হল। গজ'র আর কিছু মনে রইল না। তবে এক গাঢ় ঘুমে সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার আগে গজ টের পেল, সে জলের মধ্যে পড়েছে, কিন্তু ডোবেনি।

পঞ্চানন্দ যখন চোখ মেলল, তখনও রাতের অন্ধকার আছে।

চোখ মেলে পঞ্চানন্দ প্রথমটায় কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না, সে কোথায় এবং কেন এভাবে পড়ে আছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ায় তার হাত-পা ছড়ে গিয়ে বেশ জ্বালা করছে। মাথাটা ভীষণ ফাঁকা।

পঞ্চানন্দ উঠে বসে মাথাটা আচ্ছাসে ঝাঁকাল। নিজের গায়ে নিজে চিমটি দিল। বেশ করে আড়মোড়া ভেঙে একখানা মস্ত হাই তুলল। তারপরই জিনিসটা টের পেল সে। খিদে। হ্যাঁ, পেটটা তার মাথার চেয়েও বেশি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

খিদে টের পাওয়ার পরই ঝপ করে সব ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। জলায় একটা গগনচাকি নেমেছে। সে তাই এখানে হাজির হয়েছিল। ঝোপের আড়ালে বসে নজর রাখতে রাখতে....

ঘুমিয়ে পড়েছিল ?

না, পঞ্চানন্দ তত অসাবধানী লোক নয়। অমন একটা ঘটনা সামনে ঘটতে চলেছে, আর সে ঘুমিয়ে পড়বে—এ হতেই পারে না।

তা হলে !

পঞ্চানন্দ উঠে পড়ল। তারপর আতিপাঁতি করে চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগল টর্চ দিয়ে। টর্চটা তার হাতের মুঠোতেই থেকে গিয়েছিল।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। মাত্র হাত-দশেক দূরে একটা বুনো কুলগাছের আড়ালে একটা লম্বা টর্চের মতো বস্তু পড়ে আছে।

যন্ত্রটা হাতে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল পঞ্চানন্দ। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না। কোনও যন্ত্রই হবে, তবে কী কাজে লাগে, তা কে জানে। গায়ে অনেকগুলো বোতাম আছে। পঞ্চানন্দ সাবধানী লোক, সে কোনও বোতামে চাপটাপ দিল না, কী থেকে কী হয়ে যায়, কে বলবে। তবে যন্ত্রটা সে কাছে রাখল।

জলার দিকটা আগের মতোই আঁধারে ঢেকে আছে।

পঞ্চানন্দ চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে-ধীরে জলার দিকে এগোতে লাগল।

যেখানে চাকিটা নেমেছিল বলে তার ধারণা সেখানে তুঁতেবন। জংলা জায়গা। অনেকটা জলও পেরোতে হবে। তবে জলার জলও কখনই হাঁটুর ওপরে ওঠে না।

পঞ্চানন্দ কাপড়টা একটু তুলে পরে নিল। তারপর ঠাণ্ডা জলে কাদায় নেমে পড়ল দুর্গা বলে। মাঝে-মাঝে একটু থেমে দিকটা ঠিক করে নিতে হচ্ছিল। টর্চটা সে ভয়ে জ্বালল না।

জল ভেঙে ঢিবিটার ধার দিয়ে ভাঙা জমির দিকে উঠবার সময় হঠাৎ একটা মস্ত পাথর বা অন্য কিছুতে পা বেধে দড়াম

করে পড়ল পঞ্চানন্দ। এই শীতে জামা-কাপড় জলে কাদায় একাকার।

তবে পঞ্চানন্দর এসব অভ্যাস আছে। শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে সে টর্চটা হাতড়ে বের করল। বেশ ভাল টর্চ, ভিজেও নেবেনি।

কিন্তু টর্চ জ্বেলে যা দেখল পঞ্চানন্দ তাতে হাঁ হয়ে গেল। একটা বিশাল চেহারার লোক পড়ে আছে জলায়।

পঞ্চানন্দ টর্চটা নিবিয়ে নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখল। না, মরেনি, নাড়ি চলছে, শ্বাস বইছে।

পঞ্চানন্দ চারদিকটা আবার ভাল করে দেখে নিয়ে হাতের আড়াল করে টর্চটা লোকটার মুখে ফেলল।

মুখটা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। অথচ কিছুক্ষণ চিনতে পারল না পঞ্চানন্দ।

দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালতেই সন্দেহ কেটে গেল।

লোকটা গজ-পালোয়ান।

নামে আর কাজে পালোয়ান হলেও গজ'র কখনও এমন হাতির মতো চেহারা ছিল না। বরাবরই সে পাতলা ছিপছিপে। ছিপছিপে শরীরটা ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত আর পোক্ত।

কিন্তু এই গজ-পালোয়ান গামার চেয়েও বিশাল। দুটো হাত মুগুরের মতো, ছাতি বোধহয় আশি ইঞ্চির কাছাকাছি। ঘাড়ে-গর্দানে এক দানবের আকৃতি।

পঞ্চানন্দ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। গজ'র এরকম পরিবর্তন হল কী করে। মাত্র দু'দিন আগেই গজকে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে দেখেছে সে। মাত্র দু'দিনে কারও এরকম বিশাল চেহারা হয় ! (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়

রয় দেখল, রেগে আগুন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রজার ডিক্সন

রজার ডিক্সনকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে খাপ্পা হয়ে প্রতীক্ষা করছে রয়ের জন্য। হাফ-টাইমে রয় ড্রেসিং রুমে ফিরে আসছে। সে জানে, ডিক্সনকে শান্ত করা সহজ হবে না।

ন্যায্য গোল দিল না !

চালিয়ে যাও, রয় !

রয় ড্রেসিংরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখল ...

গম্ভীর মুখে রজার ডিক্সন দাঁড়িয়ে আছে।

খানিক বাদে ... রয়ের ঘরে ...

তুমি কি সত্যি কথাটা শুনতে চাও রজার ?

জানতে চাই, তুমি আমাকে বসিয়ে দিলে কেন ?

ভিককে বসালে ডিফেন্স দুর্বল হত। তাই তোমাকেই বসানো হল।

তোমার উপরে আমার ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ নেই।

কিন্তু, বলি দেবার জন্যে তুমি আমাকেই বেছে নিলে।

আমি রোভার্সের হয়ে খেলতে চাই না !

রজার !

ড্রেসিংরুমে ফিরে এল রয় ...

মিটল ?

খোলাখুলি কথা হয়ে গেল। চলো, মাঠে নামা যাক।

দ্বিতীয়ার্ধে বিপক্ষ-শিবিরে বারে-বারে হানা দিচ্ছে রোভার্স ...

গোল চাই ! গোল চাই !

এখনও একটা গোল শোধ করতে হবে !

কিন্তু ...
উঃ !
ফাউল !
ওকে হলুদ কার্ড দেখালেন না কেন ?
তোমাকে ভাবতে হবে না। খেলে যাও।
রয়কে কখনও এত রাগতে দেখিনি !
একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ? যত বড় খেলোয়াড়ই হোক ...
রয়ও রক্তমাংসের মানুষ, রাগ তারও আছে !
রয় ফ্রি-কিক নিচ্ছে ...
রয় যা রেগেছে, জাল ছিড়ে দেবে !
রয় কিন্তু শট না-নিয়ে ভড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল ...
প্যাকো !
চিপ করে বল দিয়েছে ...
সেখান থেকে রয়ের পায়ে ...
গোল !
সব শোধ !
গোল হতেই বাজল খেলা-শেষের বাঁশি ...
রয় আজ একাই লড়েছে !
শাবাশ রয় !
এখন তো ওরা হাততালি দিচ্ছে ...
শাবাশ !
আমি যা করতে চাই, তা জানলে দেবে কি ?
রয় কী করার কথা ভাবছে, বলতে পারো ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে

অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–
এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

মুভি ক্যামেরা ও একটি গোঁয়ার গণ্ডার

মঞ্জরী লাহিড়ী

কেনিয়ার মেরু ন্যাশনাল পার্ককে বিখ্যাত করে দিয়ে গেছেন জয় অ্যাডামসন। 'বর্ন ফ্রি' চলচ্চিত্রের এল্‌সা নাম্নী সিংহী এখানেই ঘুরে বেড়াত। এখানেই আছে অ্যাডামসনের কটেজ, এল্‌সার কবর।

নাইরোবি থেকে শ'দুয়েক কিলোমিটার দূরে এই ন্যাশনাল পার্ক। পার্কটি বিশাল, প্রায় সাতশো স্কোয়ার মাইল। এই পার্কটির খ্যাতি এল্‌সার জন্য তো বটেই, এ ছাড়া আছে হাতি, গ্রিভি জেব্রা, এল্‌সার মাসতুতো-পিসতুতো ভাই-বোনেরা, রেটিকুলেটেড জিরাফ এবং হোয়াইট রাইনো।

হোয়াইট রাইনো নামটা শুনলে মনে হয় সাদা গণ্ডার, তা কিন্তু নয়। ডাচ্ শব্দ weit মানে ওয়াইড, সেটাই এদেশের লোকের উচ্চারণে হয়ে গেছে হোয়াইট। এই প্রজাতির গণ্ডারের ঠোঁট চওড়া, মানে স্কোয়ার লিপ্‌ড। সেজন্য বহুকাল আগের Weit rhino এখন 'হোয়াইট রাইনো' নামে খ্যাত। ধূসর বর্ণের এই জীবটি হাতির পরেই বড় মাপের স্থলচর জীব। ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন।

এই গণ্ডার-শ্রেণী এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। সেজন্য মেরু ন্যাশনাল পার্কে এদের এনে সযত্নে রাখা হয়েছে সতর্ক প্রহরায়। এবারকার গল্প এই সযত্ন-পালিত একটি হোয়াইট রাইনোকে নিয়েই।

গল্পটা আরম্ভ করার আগে গণ্ডার সম্বন্ধে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, গণ্ডাররা খুব কাছের জিনিস ছাড়া একদম ভাল করে দেখতে পায় না। সেজন্য যে-কোনও অস্বাভাবিক শব্দে এবং গন্ধে (এদের গন্ধ আলাদা করে চেনার শক্তি মোটামুটি ভালই) অন্য জানোয়ার যখন দূরে চলে যেতে চায় গণ্ডাররা সাধারণত দৌড়ে এসে জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে যায়, যাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে হয় তাড়া করে আসছে। যদিও গণ্ডারপ্রেমী পশুবিজ্ঞানীরা কখনওই গণ্ডার তেড়ে এলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে উপদেশ দেন না। কারণ গণ্ডার একটু বদমেজাজিই হয়। বহু বছর ধরে এত বেশি গণ্ডার শিকার করা হয়েছে এবং এখনও লুকিয়েচুরিয়ে শিকার করা হয় বলে বেঁচে থাকবার জন্যই এদের মেজাজ একটু দাঁত-খিচোনো মতো হয়ে গেছে।

হোয়াইট রাইনোরা সাধারণত চরেই খায়। ইংরেজিতে যাদের বলে গ্রেজার। মেরু ন্যাশনাল পার্কের সদাসতর্ক প্রহরায় থেকে ক্রমাগত রেঞ্জারের পর রেঞ্জার দেখতে-দেখতে এখানকার হোয়াইট রাইনোরা প্রায় পোষমানা জীবের মতোই হয়ে গেছে। এখানকার অন্যতম ট্যুরিস্ট-আকর্ষণ হল হোয়াইট রাইনোর পিঠে বসে ছবি তোলা।

আমাদের পরিচিত একটি গুজরাতি পরিবার নাইরোবিতেই

২০১১ খৃষ্টাব্দের স্থপতি !

আপনার ছেলের অনেক সহজাত গুণ আছে। কিন্তু বড় হওয়ার সংগে সংগে ওর এই প্রতিভা কি পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে ? ওর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে ওকে সবরকম উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, জীবন সরু করার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে আপনি কি ওকে সাহায্য করতে পারবেন ?

ওর ভবিষ্যতের জন্য আজই চিন্তা করুন

এল আই সি তে আপনার সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করুন। সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী পলিসি করা যায়, আপনার ছেলের উচ্চশিক্ষা, বিবাহ অথবা পেশাগ্রহণ যে কোনো কাজের জন্য।

আপনার এল আই সি এজেন্টের সংগে আজই যোগাযোগ করুন। এক সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি খুশি হবেন।

আপনার এবং আপনার ছেলের জন্য।

NPS-LIC-B-2/85

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জীবন বীমার বিকল্প নেই।

থাকেন, যদিও এঁরা আসলে মেরু শহরেরই লোক। দুই ভাই এবং তাঁদের স্ত্রী-পুত্র নিয়েই পরিবার। এই বাড়ির ছোট ভাইয়ের খুব ছবি তোলার শখ। একদা একটি মুভি ক্যামেরা সওদা করার পর তিনি স্থির করলেন এবার একবার মেরু ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ারদের নানা ভঙ্গির ছবি তুলতে হবে। মেরু ন্যাশনাল পার্ক এঁদের বহুকালের চেনা জায়গা। ছোট ভাইয়ের উপরোধে বড় ভাইও এই ছবি-তোলা অভিযানের সঙ্গী হলেন। এক গ্রীষ্মের বিকেলে মেরু ন্যাশনাল পার্কে পৌঁছে দেখেন, আলো খুবই কমে এসেছে, ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব। পর দিন সকাল হতে না হতেই মুভি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরোনো হল। হরিণ, বেবুন জিরাফ ইত্যাদির ছবি-টবি তুলে এঁরা হানা দিলেন হোয়াইট রাইনোর ডেরায়। এর আগে এঁরা বহুবার এসেছেন। হোয়াইট রাইনোর রক্ষকদেরও চেনেন। ল্যাণ্ডরোভারটিকে ঠিকমতো পজিশনে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা শুরু হল। হোয়াইট রাইনোটি মুখ নিচু করে ঘাস খাচ্ছে, এই ভঙ্গিতে তিনটে ছবি নেবার পর ক্যামেরাম্যান ছোটভাই দাদাকে অনুরোধ করলেন, গাড়ি থেকে নেমে গণ্ডারটির শিং কিংবা লেজ ধরে একটু নাড়াতে।

মুভি ক্যামেরা কেনা হয়েছে, মেরু ন্যাশনাল পার্কে আসা হয়েছে 'অ্যানিম্যাল্‌স ইন অ্যাকশন' ছবি তোলা হবে ; তাই বলে অ্যাকশন-পিকচার মানে কি শুধু ঘাস খাওয়ার ছবি ?

বড় ভাই মিঃ প্যাটেল শান্তিপ্রিয় মানুষ। হুজুগে পড়ে এসেছেন। ছোট ভাইয়ের কথা শুনে একটু নাক কুঁচকে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। আসল কারণ হল, মেরুর হোয়াইট রাইনোদের শিষ্টতা একটি সর্বজনবিদিত তথ্য। এরা প্রায় পোষা বেড়াল-টেড়ালের মতোই হয়ে গেছে, লোকে বলে। চেহারাটাই যা একটু ধুমসো। ট্যুরিস্ট পিঠে নিয়ে আকছার ছবি তুলছে, পোজ দিচ্ছে। মিঃ প্যাটেল নাক কুঁচকেছিলেন জঙ্গুলে পোকা-মাকড়দের জন্য। হোয়াইট রাইনোদের সভ্য আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কারও মনে সামান্যতম উদ্বেগ ছিল না।

এই পর্যায়ে হোয়াইট রাইনোর রক্ষক দু'জন সামান্য দূরে বসে গল্পগাছা করছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা জানেন যে, যাঁরা এসব মুভিটুভি নিয়ে ছবি তুলতে আসেন, বহুবিধ কেরামতি দেখানোর কারণে এঁদের প্রচুর সময় লাগে।

গণ্ডারটি মুখ নিচু করে ঘাস খাচ্ছে। যদিও পোষমানা জীবদের মতোই এদের হাবভাব, তবু বড় ভাই মিঃ প্যাটেল শিংয়ে হাত দেওয়াটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। হাজার হোক গণ্ডারের শিং। ক্যামেরাম্যানের উদ্দেশে তিনি জানালেন যে, লেজ ধরে একবার টেনেই তিনি গাড়িতে ফিরে আসবেন। কারণ পুরো জায়গাটাই গণ্ডার নোংরা করে রেখেছে।

লেজে হাত পড়তে না পড়তেই গণ্ডারটি ওই বিশাল চেহারা নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল। মিঃ প্যাটেল মুহূর্ত-খানেক মাত্র সময় পেলেন। ঠিক হাটারি ছবিতে যেমন দেখা গেছে, গণ্ডারটি মাথা নিচু করে খড়্গ বাগিয়ে তাড়া করল। গণ্ডারকে দৌড়তে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত যে, ওই চেহারা নিয়ে তারা কী অসম্ভব দ্রুত দৌড়তে পারে।

গণ্ডারদের প্রিয় একটি বুনো ডুমুরগাছ ছিল হাত-দশেক

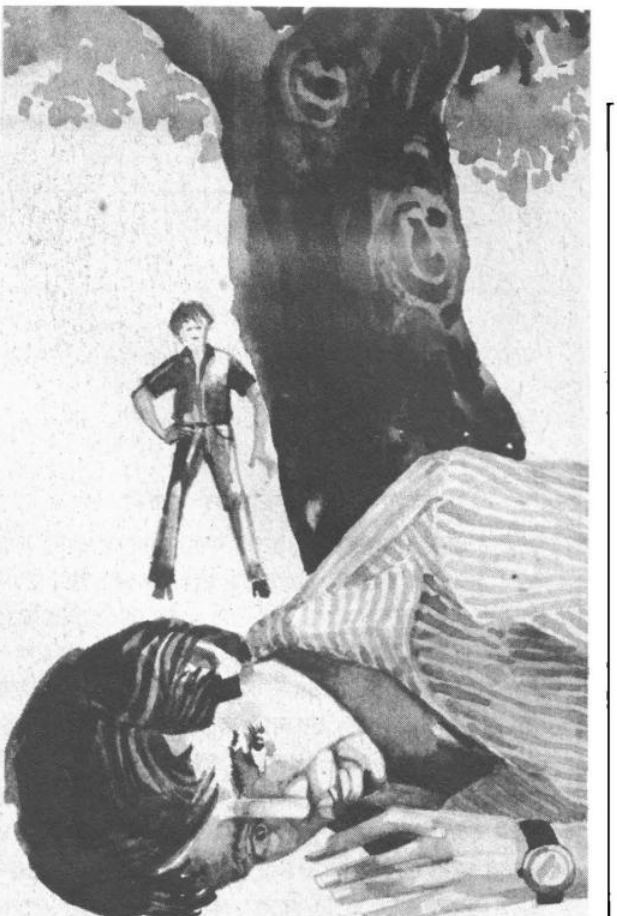

দূরে। সমস্ত ওলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে সিনিয়র মিঃ প্যাটেল সেই গাছটি লক্ষ্য করে দৌড়লেন। পেছনে হোয়াইট রাইনো। বুনো গণ্ডারের সঙ্গে জঙ্গলে দৌড়নো কি কেউ আর প্র্যাকটিস করে ? ডুমুরগাছটির একটি বেরিয়ে আসা শেকড়ে পা আটকে গিয়ে সশব্দে একটি আছাড় খেলেন মিঃ প্যাটেল এবং একটুও সময় নষ্ট না করে শুয়ে শুয়েই খানিকটা গড়িয়ে গেলেন। গাছের যে শেকড়টিতে পা লেগে মিঃ প্যাটেল আছাড় খেয়েছিলেন, হাত-খানেক দূরে তার পাশের শেকড়টিতে খড়্গ বিঁধিয়ে গণ্ডারটি দাঁড়াল। এবারও মাত্র মুহূর্ত-খানেক। সেই অবকাশেই সুপার হিউম্যান অ্যাথলেটিক পারফরম্যান্স দেখিয়ে মিঃ প্যাটেল গাছের ওপরে। অত্যন্ত বিরক্ত মেজাজ নিয়ে গণ্ডারটি গাছের গুঁড়িতে খড়্গাঘাত শুরু করল। অবশ্য এই দৃশ্যটি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ হোয়াইট রাইনোর রক্ষক দু'জন ততক্ষণে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে গণ্ডারটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। কিন্তু এত বিশদ করে বর্ণনা যে দিতে পারলাম, তার কারণ পুরো ঘটনাটাই আমি দেখেছি ছোট ভাইয়ের তোলা মুভিতে।

ক্যামেরাম্যান ছোট ভাইয়ের এটাই সবচেয়ে বাহাদুরি যে তিনি এত কাণ্ডেও ছবি তোলা বন্ধ করেননি। গণ্ডার মানুষকে তাড়া করেছে এ-ঘটনার সাক্ষী হওয়া কি সাধারণ সৌভাগ্য। তাঁর মুখের ভাষায়, "ইটস আ রেয়ার ইনসিডেন্ট অ্যাণ্ড ইউ সি ইট ইয়োরসেলফ, ইটস আ রেয়ার পিকচার।"

আমি যখন ছবি দেখেছি তার কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না খুব স্বাভাবিক কারণেই।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

জেনে নাও

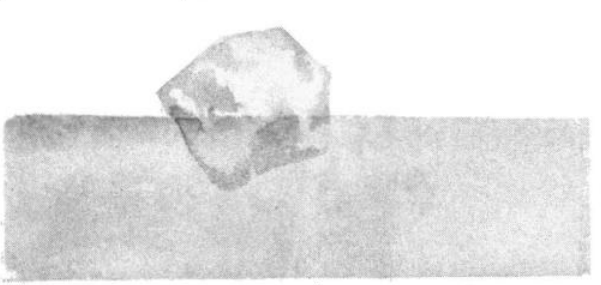

বরফ জলে ভাসে কেন ?

গেলাসের শরবতকে ঠাণ্ডা করার জন্যে যখন তার ওপরে বরফের টুকরো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন সে বরফ কি জলের মধ্যে ডুবে যায় ? না, তা জলের মধ্যে ডুবে যায় না। সব সময়ে জলের ওপরে ভাসতে থাকে।

কেন ? বরফ জলে ভাসে কেন ? হাতে ধরলে বরফকে তো হালকা বলে মনে হয় না। তা হলে বরফ জলে ডুবে না যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ?

আসলে বরফ যতটা জল সরায়, সেই সরানো জলের ওজন বরফের ওজনের চেয়ে বেশি। বরফের ওজন তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সরানো জলের ওজন তাকে ঠেলে রাখে ওপর দিকে। আর এই সরানো জলের ওজন বরফের ওজনের চেয়ে বেশি বলে বরফ জলে ভাসে।

জলভরা মেঘ দেখতে কালো কেন ?

কালো মেঘ যখন আকাশের কোণে জমা হয়, তখন তা দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে বৃষ্টি নামল বলে। দিনের বেলাতেও চারদিক কত সময় অন্ধকার হয়ে আসে।

কিন্তু জলভরা মেঘ কালো কেন ?

সূর্য যে আলো দিচ্ছে, তাতে আছে সাতটা রঙ। যে জিনিসকে আমরা সাদা দেখি, তা সাতের সব কটা রঙকেই ফিরিয়ে দেয়। আবার যা সবুজ বা নীল তা শুধু সবুজ বা নীল রঙকেই ফেরত পাঠায়। কিন্তু যা কালো তা টেনে নেয় সব রঙ।

জলভরা মেঘে অসংখ্য জলকণা ঘন হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে কোনও রঙ বেরিয়ে এসে আমাদের চোখে পড়ে না বলে তা কালো দেখায়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত
লবঙ্গ তেলের
গুণ তো বুঝছেন!

প্রমিস
আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস
- দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
- মুখে আনে সুস্বাদ, আর
- দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী

সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল
শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

বালসারা উৎপাদন
CHAITRA-BLS-668 BEN

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ইন্দ্রজাল-স্পেক্ট্রাম কমিক্‌স প্রতিযোগিতা

ওহো! খোসগল্পের জগৎ থেকে খাস ডিজনিল্যাণ্ডে! বিনাখরচায়!

তোমার প্রিয় সুপারহিরোরা এবার পাইয়ে দিতে পারেন তোমায় দারুণ পুরস্কার।

২
১-ম পুরস্কার

ইউ.এস.এর ডিজনিল্যাণ্ডে পুরো একটি ফুর্তিভরা সপ্তাহ মজা করে কাটানো। (হোটেলের ব্যবস্থাসমেত)

PAN AM.
You can t beat the experience

৫
২-য় পুরস্কার

কালার টিভি
KELTRON Color man TRAC

৩
৩-য় পুরস্কার

মজার সফর দূরপ্রাচ্যে ঘুরে ব্যাংকক-পাট্টায়া-সিঙ্গাপুরে।

TCI

১২
৪-র্থ পুরস্কার

বি এস এ—এস এল আর. বাইসাইকেল।

১০০
৫-ম পুরস্কার

তরঙ্গ
২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টার।

KEONICS

বিনামূল্যে!
EMI HMV
এইচএমভি ক্যাসেট স্পেক্ট্রাম কমিক্‌স-এর প্রথম ৫০০ জন গ্রাহকের জন্য।

যোগদানের নিয়ম···কি করে জিতবে!
তোমার প্রিয় সুপারহিরোরা এবার তোমায় একটি রহস্যের সমাধান করতে দিচ্ছে। আগে সেটা করে নাও, তারপর ১০-টি শব্দের বেশি না হয় এমনভাবে আমাদের বলে দাও—ম্যানড্রেককে ফ্যান্টমের কি বলবার আছে (প্রবেশপত্র দেখ)।

প্রবেশপত্র পাবে ১৫ই/২২শে/ ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের সমস্ত ইন্দ্রজাল কমিক্‌স সংখ্যায়। আর পাবে স্পেক্ট্রাম কমিক্‌সের প্রথম ৪-টি পরিচায়ক সংখ্যায়, যেগুলি প্রকাশিত হবে ৬ই থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে।

SPECTRUM COMICS

টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া গ্রুপ অফ পাব্লিকেশন্স থেকে

everest/85/IC/504/BN

মেছুড়ে

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পেঁচোর বাপ এঁচোড় খায়
কেঁচোর টোপ মাছ ধরায়
তার লাগে। পেঁচোর রোজ
করতে হয় কেঁচোর খোঁজ
গ্রাম ঘুরে ; পাঠশালায়
ফাঁক পেলেই তাই পালায় ;
ক্বচিৎ পায় বোলতা-ডিম।
বিদ্যে হয় ঘোড়ার ডিম।
পেঁচোর বাপ নির্বিকার,
বকেও না ছেলেয় তার
কেঁচোর টোপ ওজনটাক,
বোলতাচাক এক ছটাক
এই পেলেই তার হল,
সঙ্গী তার ছিপ পোলো।
সহজ কাজ মাছ ধরা ?
পচিয়ে খোল 'চার' করা ?
বাপের মা'র পুকুরঘাট
চোপরদিন, বাজারহাট
পেঁচোয় তাই করতে হয় ;
ছ্যাঁচোড় চোর সেই সময়
নেয় দু'চার এঁচোড় ওর
রোজ জানে চতুর চোর,
পেঁচোর বাপ দেখেও তা
ছিপ ছেড়ে নড়বে না।
মাছ পালায় তার পাছে :
"থাক গরিব, ঠিক আছে।"
কাঁঠাল তার গাছ-পাকা
জুটল না : গাছ ফাঁকা
সাতদিনেই। পাঁচজনাই
বেকুব কয়। গ্রাহ্য নাই।
পেঁচোর বাপ অতঃপর
মাছ নিয়ে ফিরলে ঘর
মাছের ঝোল ভাজার সাথ
এক কাঁসি গিলতে ভাত
কেঁচোর খুঁট জড়িয়ে গায়
মোচার চপ নিত্য খায়।

লোকটা

রথীন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্যামবাজারের পাঁচমাথাতে লোকটা থাকে,
একটু জটিল ;
পাশ দিয়ে কেউ হাঁটতে গেলে খাবেই খাবে
দু'চারটে কিল।
আঁচড়ে এবং কামড়ে দিয়ে হঠাৎ বেগে
আড়চোখে চায়,
দুই কোমরে দু'হাত রেখে ভাবখানা তার—
লড়বি তো আয় !
এড়িয়ে গেলে সুযোগ বুঝে সুড়সুড়ি দেয়,
চিমটি কাটে,
অথচ সেই লোকই আবার শান্ত মনে
রাস্তা হাঁটে।
এই তো সেদিন ভরদুপুরে খেয়াল হল,
থামায় গাড়ি,
জট বেঁধে যায় রাস্তা জুড়ে ট্যাক্সি টেম্পো
মিনির সারি !
ঘোড়ায়-চড়া স্ট্যাচুর নীচে হাত-পা নেড়ে
বাজায় বাঁশি,
গণ্ডগোলটা বাধিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে
মুচকি হাসি !
তাই না দেখে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল
যেই না পুলিশ,
সেলাম ঠুকে ইংরিজিতে ধমক দিল,
"এই য়োঁ ফুলিশ !"

ছবি : দেবাশিস দেব

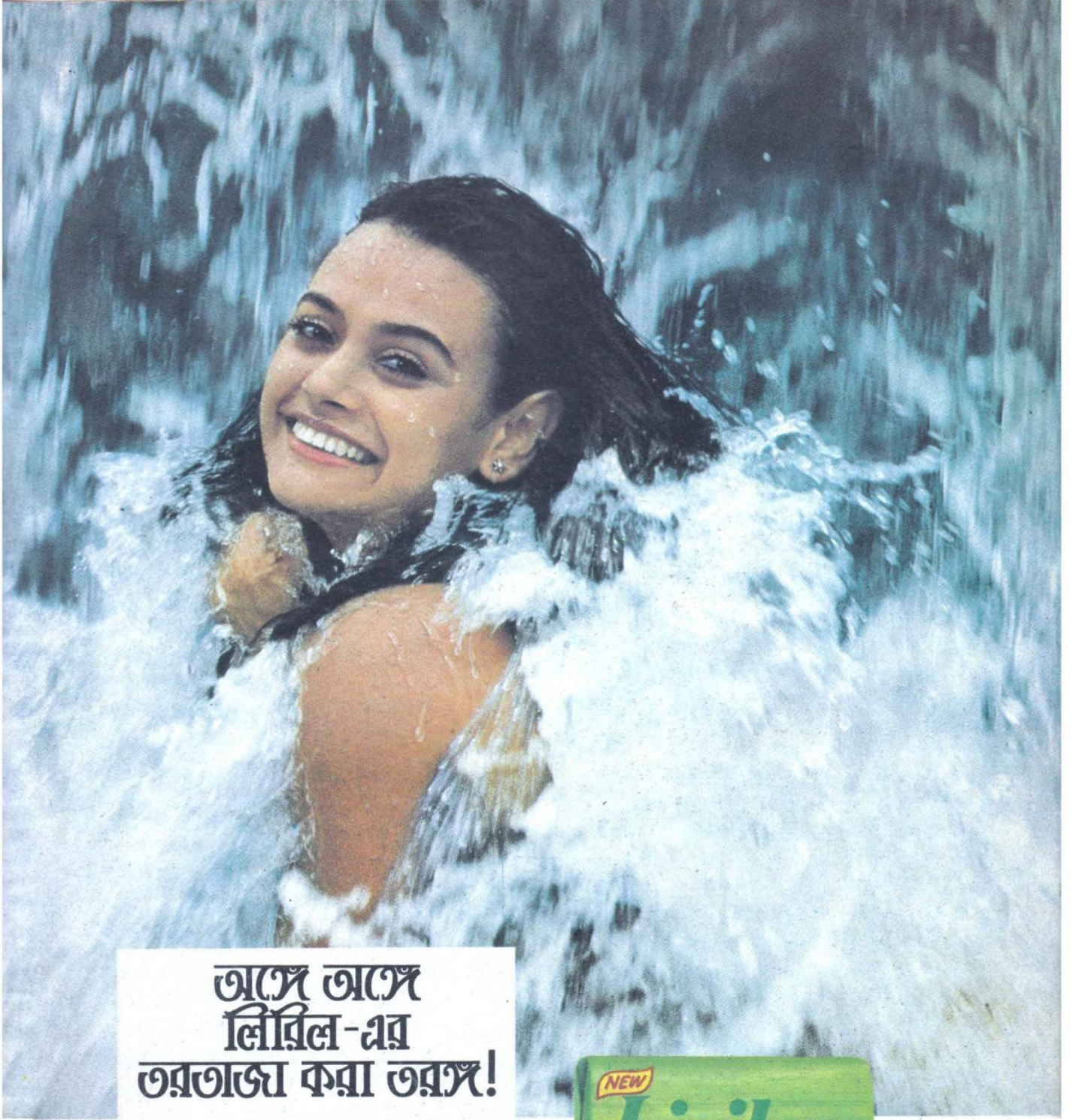

অঙ্গে অঙ্গে লিরিল-এর তরতাজা করা তরঙ্গ!

লিরিল—এবার এক সতেজতা মাখা, রেশ টেনে রাখা
অনন্য সুরভিতে—মধুর সুরভি, যেন চনমনে তরতাজা করা
মধুর তরঙ্গ—অঙ্গে অঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় সেই অনন্য মধুর আবেশ,
যার নামটি হ'ল লিরিল-এর সতেজতা!

লিরিল—লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।

নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS LR 44 2719 BG

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হো-বুড়োর খুদে বন্ধু

শৈলেন ঘোষ

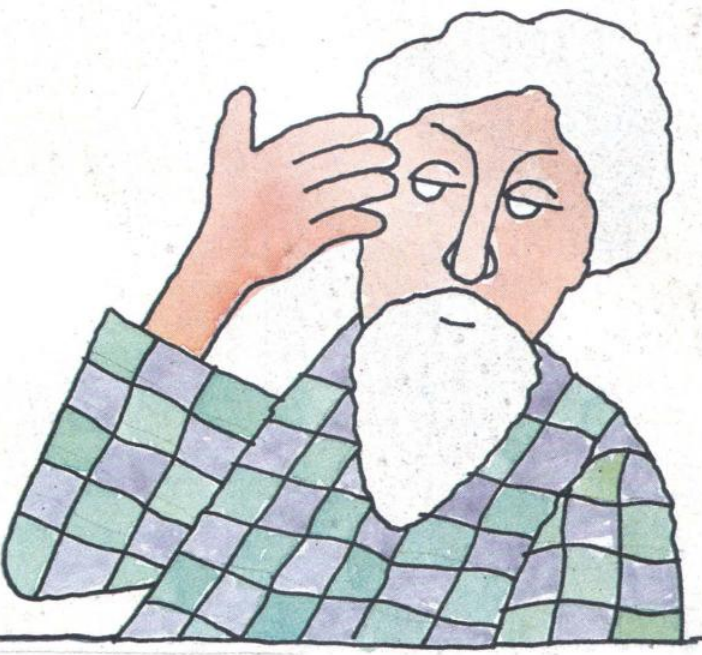

ভারী আশ্চর্য সেই মানুষটি। পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখা যাবে লোক-গিজগিজ হাট-বাজারে, সকালবেলা। ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। কখনও বা দেখতে পাবে, রোদ-দুপুরে, গাছের নীচে ব্যাঞ্জো নিয়ে সুর তুলছে। নয়তো বা সেই যেখানে বিকেলের নরম রোদে, সবুজ ঘাসে, অনেক কচিমুখের হাসি খলখলিয়ে ওঠে, সেখানে সে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করছে।

তার নাম ছিল হো। তার বয়েস যে কত, বলা শক্ত। মাথার ওপর যেন একরাশ তুষার ছড়িয়ে আছে মানুষটার। ভরাট গালের ওপর সাদা ধবধব করছে একঝাঁক দাড়ি। বুকটা এত্তখানি চওড়া। কিন্তু তার রোদে-পোড়া গায়ের চামড়া যেন একটু আলগা। কেউ-কেউ তাকে ডাকত, হো-বুড়ো। কেউ বলত, ওস্তাদ-হো। তাকে দেখতে পেলেই হল, ছেলে-বুড়ো ছুটত তার পেছনে। চেঁচাত, "একটা বাজনা শোনাও, একটা বাজনা শোনাও !"

"আচ্ছা, আচ্ছা। হচ্ছে, হচ্ছে", বলে, হো তার ঝকঝকে ব্যাঞ্জোর তারে হাত বুলিয়ে গান বাজাত। সে-গান সবার জানা। তারে সুর বাজলেই যারা শুনত, তারা আপনমনে গেয়ে উঠত :

ফুল-টুকটুক ফুলবাগানে
মৌটুসকি পাখি :
পালক-ডানায় রঙের ছবি
করছে আঁকাআঁকি।

আঃ ! কী মিষ্টি সেই সুর ! হো-র আঙুলগুলো ব্যাঞ্জোর তারের ওপর যতই নাচত, ততই তার বরফ-সাদা চুলগুলো, এলোমেলো গড়িয়ে, মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ত।

হো'র কেউ ছিল না। একা। একটি মানুষ। শহরের শেষে, যেখান দিয়ে ছোট্ট নদী একলাটি বয়ে গেছে, যেখানে নদীর এধারে ওধারে কিছু গাছ, কিছু ঝোপ, কিছু ফুল, কিছু বাঘ-খুপচুপ ঘাস হাওয়ায় দোলে, তারই পাশে হো'র একখানি ঘর। হো'র মতো সেই ঘরখানারও বোধহয় অনেক বয়েস। কোন্‌দিন না ভেঙে পড়ে ! হো ঘরখানা যে সারাবে, সে-পয়সা তো তার নেই। এই ব্যাঞ্জো শুনে, খুশি হয়ে, কেউ দুটো পয়সা দিলে, তবে তার দিন চলে।

অবিশ্যি পয়সা তাকে সবাই দেয়। সেই পয়সা তার ছেঁড়া কোটের পকেটে ফেলে সে হাঁটে। হাঁটতে-হাঁটতে ব্যাঞ্জো বাজায়। এখান থেকে চলে যায় অনেক দূরে, আর-এক জায়গায়।

সত্যিই, হো'র গায়ের কোটটার ভারী বেহাল অবস্থা। তেমনি ছিরি প্যান্টের। হিল-ফাটা জুতোয় ঘষটে-ঘষটে প্যান্টের পায়ের নীচের দিকটা ছিঁড়ে ফরফর করছে। কোটের পকেটে যত রাজ্যের হাবিজাবি এটা-ওটা। লাট্টু থেকে শুরু করে টুকরো সুতোর কাঠিম পর্যন্ত খুঁজলে পেয়ে যাবে। পথ চলতে-চলতে হো হঠাৎ একদিন একটা ছোট্ট পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছিল। এমন-কী, পুতুলও তার ঘর বেঁধেছিল ওই পকেটেই ! হো'র যখন কাজ থাকত না, কিংবা কাজ করতে মন চাইত না, তখন পকেট থেকে পুতুলটা বার করে নিজের মনে কী যে সব কথা বলত পুতুলটার মুখের দিকে চেয়ে, কে

জানে ! কথা বলতে-বলতে তাকে আদর করত। পুতুলের মাথাটা নেড়ে দিয়ে চুক করে একটা চুমু খেয়ে, পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। যেন তার নিজের মেয়ে !

একদিন হল কী, এই রে, হো'র পকেট থেকে পুতুলটা ফোক্কা হয়ে গেল ! পুতুলটা হারিয়ে গেল, না, পকেট থেকে কেউ তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল, হো তা জানতেই পারল না। পকেট থেকে তুলে নেওয়াটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। হো যখনই বাজনা বাজায়, তখন চারপাশে কী ভিড় জমে যায়। ভিড়ের মধ্যে পকেট হাতড়ে কেউ যদি পুতুল নিয়ে ভেগে পড়ে, তখন হো বাজনা বাজাবে, না চোর পাকড়াবে !

যাক গে, যাক। যা হয়ে গেছে, সে-নিয়ে তো আর মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না। যেটা গেছে সেটা একটা নেহাতই পুতুল। পুতুলের কথা অত আর কে মনে রাখে ! অবিশ্যি দু-চারদিন হো'র মনটা একটু খারাপ-খারাপ লাগল। তারপর যে-কে-সেই ! পকেটের পুতুল তার চলে গেল বটে, কিন্তু হাতের ব্যাঞ্জো তার থামল না।

অগুনতি লোক তাকে চিনত। অসংখ্য লোক তার বাজনা শুনত। কিন্তু সেই অগুনতি লোকের মধ্যে তার ছিল এক খুদে সমঝদার। অত লোকের মধ্যে কে আর তাকে চিনে রাখছে ! ল্যাকপেকে সিং সেই খুদে শ্রোতার চেহারাটা তো আর রাজপুত্তুরের মতো ঝলমলে নয় যে, দেখলেই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে ! যেমন তার আহা-মরি চেহারা, তেমনি বিচ্ছিরি তার গায়ের পোশাক ! মাথায় পাখির বাসা। শুকনো-শুকনো মুখ। ফাটা-ফাটা ঠোঁট। গালে খড়ি ফুটছে। অথচ নীল-নীল চোখ দুটো তার কেমন দ্যাখো, তিড়িং-বিড়িং এদিক-ওদিক ঘুরছে। হো-বুড়োও তাকে চিনত না। অত লোকের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় কে একটা ছেলে তার বাজনা শুনছে, সে আর অত কে খোঁজ রাখে। হো যখনই বাজনা বাজাত ছেলেটা ওই ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে, এর হাতের ফাঁক দিয়ে, ওর ঘাড়ের ফোকর দিয়ে তাকে দেখত আর বাজনা শুনত। শুনতে-শুনতে কেমন হয়ে যেত যেন ছেলেটা। কেমন চোখদুটো তার ছলছলিয়ে উঠত ! এক্ষুনি বুঝি চোখের ফোঁটাগুলি গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

বাজনা শেষ হলে, সব লোক চলে গেলেও, সেই ছেলেটা কিন্তু যেত না। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখত হো-বুড়োকে। তারপর হো যখন পকেটে পয়সাগুলো ফেলে হাঁটত, ছেলেটাও লুকিয়ে-ছাপিয়ে তার পিছু নিত। অবিশ্যি প্রথম-প্রথম হো অতটা খেয়ালই করত না। সে তো তখন পথে যেতে-যেতে আপনমনে ব্যাঞ্জো বাজায়। কে তার পিছু নিয়েছে, সে আর অত দ্যাখে কে !

কিন্তু এমনি করে রোজ-রোজ কেউ যদি মানুষটার পিছু নেয়, তবে একদিন-না-একদিন সন্দেহ তো হবেই। হয়েছিলও তাই। সেদিন ছেলেটাকে হঠাৎ দেখে ফেলেছিল হো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, হো যেই পিছু ফিরেছে, ছেলেটা একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে তীরবেগে ছুট মারলে। হো তাকে হঠাৎ ছুটতে দেখে এমন ঘাবড়ে গেল যে, মুখ দিয়ে তার কথাই ফুটল না। হাঁদার মতো চোখ উঁচিয়ে দেখতে-না-দেখতেই ছেলেটা ফুশ্। অবাক কাণ্ড তো !

সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হো আকাশ-পাতাল কত কী ভাবল। কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারল না। তখন আর কী, আবার হাঁটা। আর থেকে-থেকে পিছন দিকে ফিরে দেখা। আসছে নাকি ? না। সুতরাং হাঁটতে-হাঁটতে সিধে চলল ঘরের দিকে।

সেদিন তখন হো'র ঘরে রাত নেমেছে। অনেক রাত অবধি তো তার জেগে থাকার ক্ষমতা নেই। একে বয়েস হয়েছে, তার ওপর সারাদিন রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে, বাজনা বাজাও ! কী হাড়ভাঙা খাটুনি বলো ! তাই পেটে কিছু দিয়ে বিছানায় পড়তেই হো'র নাকে গুড়গুড়ি বাজতে শুরু করে দিল !

আচ্ছা, এত রাত্রে ও কে ? ওই যে হো'র ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারছে ? চোর নাকি ?

খট্। এই যাঃ ! মনে হচ্ছে চোরটার হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল। শব্দ হল।

"এই, কে রে !" এই সব্বনাশ ! হো'র ঘুম ভেঙে গেছে ! ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে। ছুটে এসে জানলায় দাঁড়াল।

চোর এদিকে চোখের পলকে হাওয়া ! আচ্ছা, চোরটাকে তো খুব লম্বা-চওড়া, গাঁট্টাগোট্টা বলে মনে হল না। মনে হল, যেন, একটা বাচ্চা ছেলে। হবে হয়তো ছিঁচকে চোর। হো'র ঘুমের দফারফা ! অবিশ্যি হো-র যদিও না-আছে সোনা, না-আছে দানা, তবু তার ভয়, ব্যাটা চোর যদি তার ব্যাঞ্জোটা নিয়ে পালায় ! উঃ ! এই কথাটা ভাবতেই বুকটা ছ্যাঁত করে চমকে উঠল হো। ব্যাঞ্জো গেলে তো তার সবই গেল ! ব্যাঞ্জো তার প্রাণ। ওটা আছে বলেই না দুটো পয়সা জোটে। তাই ব্যাঞ্জোর কত যত্ন। সবসময়ে ধুলো-ময়লা ঝাড়ছে। না-হয় তারগুলোকে কাপড় দিয়ে মুছছে। নিজের কাপড়-চোপড়ের অমন ছিরি হলে কী হবে ! ব্যাঞ্জোর শ্রী দেখলে তোমার চোখ ঝলসে যাবে ! হো ঝটপট জানলাটা বন্ধ করে দিল। ছুট্টে গিয়ে ব্যাঞ্জোটা বুকের কাছে নিয়ে, সেই দুপুর-রাতে জেগে বসে রইল। অন্ধকার সেই নিস্তব্ধ রাত্রে একটু যদি খুট করে এদিক ওদিক আওয়াজ ওঠে, হো চট করে ঘাড় ফিরিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দ্যাখে। মনে হয়, যেন কাছেপিঠেই দুশমন চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছে ! না বাবা, আর ঘুমিয়ে কাজ নেই !

বললে কী হবে ! ঘুম তো আর কারও কেনা গোলাম নয় যে, বললেই কথা শুনবে ! তাই শেষরাতে হো'র অ্যায়সা ঢুলুনি এসে গেল যে, বেচারা না পারে দাঁড়াতে, না পারে বসতে। শেষকালে আর কী করা, একেবারে বিছানায় সটান গড়াগড়ি। কোথায় ব্যাঞ্জো আর কোথায় কী ! ঘুমের সে কী বহর ! আহা ! ঘুমোক, ঘুমোক। মানুষটার বয়েস হয়েছে তো !

অনেকক্ষণ পর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল হো'র। তড়বড় করে উঠে পড়েছে। চটপট জানলাটা খুলে দেখে, ইশ, রোদ উঠে গেছে। আকাশ একেবারে আলোয়-আলোয় উপচে পড়েছে। না-জানি কত বেলা হয়ে গেল ! এতক্ষণে হাটে-বাজারে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কত পয়সা উঠে যেত। কে জানে, বাজার হয়তো শেষই হয়ে গেছে ! না, আর একদণ্ড দেরি করা নয়। এক্ষুনি বেরুতে হয়। মুখপোড়া চোরের জ্বালায় আজকের দিনটাই মাটি। আচ্ছা বাপু, আগে তো এ-তল্লাটে চোর-ছ্যাঁচোড়ের নামগন্ধ ছিল না। হঠাৎ

মহাপ্রভুদের আমদানি হল কোত্থেকে ? তাও না-হয় হল ! মরতে আর জায়গা ছিল না, শেষকালে এই বুড়োমানুষটার ঘরে হানা ! ভাল ঠাওরেছে জায়গা বটে ! যাই হোক, এক্ষুনি বেরিয়ে পাঁচজনকে বলে এর একটা বিহিত করতে হবে। নইলে সন্ধান যখন পেয়েছে, আবার আসতে কতক্ষণ ! যতই হোক চোর তো !

হো ঝটপট ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। একেবারে হাট হয়ে খুলে গেল দরজা। হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

"এই-ই-ই-ই !" বেরিয়েই চমকে উঠেছে হো।

কী হল ?

চেয়ে দ্যাখো, একটা ছেলে দরজার গোড়ায় পড়ে আছে ! এক্ষুনি দিয়েছিল ক্যাঁত করে এক পায়ের ঠোক্কর !

থমকে গেল হো। ভাল করে দেখল। ছেলেটা একদম চৌকাঠ ঘেঁষে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছে। হাতে ওটা কী, মুঠির মধ্যে ধরে আছে ? মনে হচ্ছে, একটা পুতুল। আরও একটু ভাল করে দেখল হো। আরে, আরে, মনে হচ্ছে, তারই সেই পুতুলটা। তবে কি এই ছেলেটাই সেই চোরটা ! হো'র পুতুল চুরি করে এখন ব্যাঞ্জোর ওপর চোখ পড়েছে !

হো আর নিমেষও দেরি করল না। সেই ঘুমন্ত ছেলেটাকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরল। ঘরের মধ্যে চ্যাংদোলা করে টেনে নিয়ে এল। ছেলেটা তো ভ্যাবাচাকা হাম্বা। হো'র হাতের চাপে, ঘুম কি আর চোখে থাকে ! চোখ থেকে দে লম্বা !

কিন্তু আশ্চর্য তো ! ছেলেটা কোথায় ভয়ে জুজুর মতো কাঁচুমাচু হয়ে থাকবে, তা নয়, হিহি হিহি করে হেসে উঠল।

হো তো তার মুখখানা দেখেই থ হয়ে গেছে ! আরে এ যে দেখি সেই ছেলেটা, তার পেছনে পেছনে ঘোরে ! হো'র রাগে কান লাল হচ্ছে ! এই বুঝি দিল এক ঘা ! না, ঘা দিল না। উলটে ধমকে উঠল, "পাজি, বদমাস, গাল টিপলে দুধ বেরিয়ে আসবে, এখন থেকেই চুরি ! ভয়ডর নেই !"

ছেলেটা আরও জোরে হেসে উঠে বলল, "ভয় করতে যাব কেন ? তুমি কি রাজার বরকন্দাজ যে, তোমাকে হুজুর, আজ্ঞে করতে হবে !"

ব্যস, ওই একটি কথাতেই হুশ্-শ্, মানে ভস্মে ঘি পড়ল। হো রেগে কাঁই। খপ করে তার ঘাড়টা ধরে, চেঁচাল, "কোন্ সাহসে তুই আমার পুতুল চুরি করেছিস ?"

"চুরি করিনি তো। তোমার পকেটে ছিল, তুলে নিয়েছি। তুমি অত বড় লোক পুতুল নিয়ে কী করবে ? খেলা করবে ?" ছেলেটা সাফ এই কথাগুলো বলে, ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

ওই হাসি দেখে হো'র যেন গা-পিত্তি জ্বলে যায়। আরও জোরে কড়কে উঠে বলল, "পকেটমার, তোকে পুলিশে দেব !"

ছেলেটা তেমনি খিলখিল করে হেসে বলে উঠল, "পুলিশ ? লোকগুলো ভাল। ক'দিন বেশ আরামে ওদের কাছে থাকা যাবে।"

আর যায় কোথায় ! হো যেন পাড়া মাথায় করল। বলল, "আগে ঠ্যাঙানির ব্যবস্থা হোক, তারপর আরাম বুঝবি। হাত-পাগুলো যখন টুকরো-টুকরো করে কাটবে, তখন আরাম কাকে বলে বুঝবি।" বলে হো, ছেলেটার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিল। এবার ঘাড় ছেড়ে হাতটাকে বেশ করে মুচড়ে

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সঙ্গে
দাঁতের হয়তো কোনো
সম্বন্ধ থাকে না–

কিন্তু, মাড়ি সুস্থ রাখার সঙ্গে থাকে অতি নিকট সম্বন্ধ!

আপনার মাড়ি যদি মজবুত না হয়, তাহলে নিঃশ্বাসেও দুর্গন্ধ হতে পারে— আর, তা ডাক্তারি মতেও সত্যি ব'লে প্রমাণিত—

অর্থাৎ, শুধু দাঁতের আপনি যত যত্নই নিন না কেন, কোনো লাভ হবে না —তা, সে আপনি যত স্বাদগন্ধযুক্ত টুথপেস্টই ব্যবহার করুন।

তবে, একটি এমন প্রমাণিত উপায় রয়েছে, যা দিয়ে দাঁত ও মাড়ি দুইয়েরই যত্ন নেওয়া সম্ভব—যা হ'ল, সুবিখ্যাত ফরহ্যান্স উপায়।

ফরহ্যান্স শুধু এক সাধারণ টুথপেস্টই নয়—এটি বিশেষভাবে তৈরী করেন এক দাঁতেরই ডাক্তার—যিনি, দাঁত সুস্থ রাখার সঙ্গে মাড়িরও যে কত অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে তা ভালরকম বুঝেছিলেন।

দুর্বল মাড়ি দাঁতকে ধরে রাখতে পারে না, যার ফলে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পোকা ধরতে পারে।

ফরহ্যান্স-এ এক বিশেষ অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট থাকে যা মাড়িকে সত্যি সত্যিই শক্ত করে আর দাঁতকে সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখে আর ফলে, আপনার নিঃশ্বাসও হয়ে ওঠে সাফ ও তরতাজা।

তাই, ফরহ্যান্স ব্যবহার করা এখনও না শুরু করে থাকলে, আজই শুরু করুন। তারপর, যত বছরের পর বছর পার হতে থাকবে, তত বুঝতে পারবেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ফরহ্যান্স-এর বিশেষ যত্নের ওপর কেন এত আস্থা রাখে।

ফরহ্যান্স – আপনার মাড়ির জন্যে তৈরী টুথপেস্ট

এবার
এক
আকর্ষণীয়
নতুন প্যাকে!

403-GM-244 BEN

ধরে জিজ্ঞেস করল, "আর কী চুরি করেছিস ?"

ছেলেটা উত্তর দিল, "না, আর কিছু নয়।"

হো জিজ্ঞেস করল, "আর কী নেবার মতলব ?"

"আবার কী নেব ?"

"তবে এখনও আমার ঘরে চোখ কেন ?"

"তোমার ব্যাঞ্জো শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি কী সুন্দর বাজাও।"

"চোপ," হঠাৎ হো তেড়ে উঠল, "শুনতে ভাল লাগে ! রাত্তিরে আমার ঘরে উঁকি মারছিলি কেন ?"

"দেখছিলুম।"

"কী দেখছিলি ?"

"ব্যাঞ্জোটা।"

এই না শুনে হো ঝট করে ছেলেটার হাতে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে, ছেলেটা সামলাতে না পেরে ধপাস করে ঘরের মেঝেয় ছিটকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে হো ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে ধাঁ করে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিলে। তারপর তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "থাক্ বন্দী হয়ে। পুলিশকে আগে ডেকে আনি, তারপর তোর ব্যবস্থা হবে।" বলে হো গজগজ করতে করতে থানার দিকে হাঁটা দিলে।

তক্ষুনি ছেলেটা জানলায় মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বিশ্বাস করো হো-বুড়ো, আমি চোর নই, আমি চোর নই। আমি তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। হো···"

হো হাঁটতে হাঁটতে তেমনি গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে, "ওসব প্রাণ-জুড়নো কথা অন্য জায়গায় বলবি ! আগে উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করি, তারপর বাজনার কথা ! বলতে-বলতে হো চলল। আর সত্যি সত্যিই পুলিশ ডাকতে চলল।

অগত্যা ছেলেটার চেঁচানি ঝিমিয়ে গেল। সে হাঁদার মতো জানলায় মাথা ঠেকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল রাস্তার দিকে, অনেকক্ষণ।

হো সত্যিই ভীষণ চটেছে ! হন্‌হন্ করে সে থানার দিকেই হাঁটছে। রেগে লাল-টকটকে চোখ তার যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ! বাব্বা ! দ্যাখো আবার, একটা না কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে বসে ! হ্যাঁ, সে পুলিশকে কী কী নালিশ করবে, তার একটা ফিরিস্তি মনে মনে ভাঁজতে লাগল। ফিরিস্তিটা মস্ত না করলে তো নালিশ জবরদস্ত হবে না !

কিন্তু সে পুলিশকে বলবেটা কী ? সেটা সে কিছুতেই গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না। আচ্ছা ধরো, সে যদি বলে ছেলেটা একটা আস্ত ডাকু, সে তার পুতুল চুরি করেছিল ! তখন কি সেটা একটা খুব গুরুতর অভিযোগ বলে পুলিশ মনে করবে। তা ছাড়া এটা কি খুব একটা বলার মতো কথা ! পুতুল চুরি ! শুনলে পুলিশ যদি মুচকি-মুচকি হাসে ! এমনকী হো'কে যদি পাগল ঠাওরায় ! নাহ্, এ কথাটা বলা যাবে না। তার চেয়ে বলা ভাল ছেলেটা তার পকেট মেরেছে ! কই না তো, পকেট তো সে মারেনি ! এ তো ডাহা মিথ্যে ! অমন একটা ছোট ছেলের নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলা ! ছিঃ, ছিঃ। হো বেঁচে থাকতে তা করতে পারবে না। তবে, ছেলেটা যে রাতের অন্ধকারে জানলা দিয়ে তার ঘরের ভেতর উঁকি মারছিল এটা তো বলা যাবে ! এটা তো আর মিথ্যে নয় ! কিন্তু কেন উঁকি মারছিল ? নিশ্চয়ই চুরি করার মতলবে ? নিশ্চয়ই তার ওই ব্যাঞ্জোটা সে চুরি করার ফন্দি এঁটেছিল ! হ্যাঁ, এইটাই বেশ জবরদস্ত নালিশ ! কিন্তু তবে যে ছেলেটা বলল, সে চুরি করতে আসেনি, সে তার ব্যাঞ্জো শুনতে এসেছিল ! ছেলেটা কি তবে মিথ্যে বলল ! না, না, তাই বা কেমন করে হবে ! ওইটুকু একটা বাচ্চা ছেলে, সে কখনও মিথ্যে বলতে পারে না ! তা ছাড়া ছেলেটার বয়েসই বা কত হবে ! খুবজোর ন' বছর। না, না। ন'বছরের একটা বাচ্চা কখনও এ-কথাটা বানিয়ে বলতে পারে না। ছেলেটার মুখখানা, আহা···

এই দ্যাখো, বলতে-বলতেই হো একেবারে আনমনে পুলিশ-থানার সামনেই চলে এসেছে। হো থানা দেখেই থমকে যায়। দাঁড়ায়। একটু ভাবে। তারপর থানার ফটকের দিকে পা চালায় ! ঢুকতে যাবে, হঠাৎ মনটা কেমন যেন দোনোমনো করে উঠল। হঠাৎ যেন ছেলেটার মুখখানা মনে পড়ে যায়। তার সেই খিলখিল করে হাসির শব্দটা যেন কানে বেজে ওঠে। হো যেন শুনতে পায়, ছেলেটা চেঁচাচ্ছে, আমি চোর নই, আমি চোর নই। আমি তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম।

মুখ ফেরায় হো। ছুট দেয় থানার সামনে থেকে। একটু দূরে এসে দাঁড়ায়। হাঁফায়। অমন ভয়ংকর রাগটা যেন নিমেষে ফুশ করে উবে গেল। একটা অজানা ভয়ে মানুষটা যেন কুঁকড়ে যায় ! অবাক কাণ্ড ! হঠাৎ এত ভয় কিসের ? ওই যে পুলিশের হাতে লাঠি, ওই দেখে ভয় পেয়েছে। লাঠিটা কত বড়। নিশ্চয়ই খুব শক্ত। ছেলেটার নামে নালিশ করলে পুলিশ তো তাকে ছেড়ে দেবে না। ওই লাঠি দিয়েই হয়তো মারবে। না, না। ওই লাঠি কখনও সহ্য করতে পারে একটা ওইটুকু বাচ্চা ছেলে ! মাথা ফাটলে ? রক্ত ঝরলে ? আহা রে, সত্যি, কী সুন্দর হাসে ছেলেটা। দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা না হলেও, কেমন থরে-থরে সাজানো। চোখ দুটো কী অদ্ভুত নীল ! হাসলে ঠোঁট দুটিতে কেমন ঢেউ খেলে !

নালিশ করা তার হল না। ছেলেটার মুখখানা যতই তার চোখের ওপর ভেসে উঠছে, নালিশ করার কথা ততই তার মন থেকে মুছে যাচ্ছে। তাই তো, ছেলেটা কে ?

হো আর একদণ্ড দাঁড়াল না সেখানে। ফিরে চলল। কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে ? পুলিশের লোক সঙ্গে না নিয়ে হো একা ঘরে ফিরলে, ছেলেটা যদি মজা করে হাততালি দিয়ে বলে, পুলিশ এল না, এল না, তখন ? ছিঃ, ছিঃ ! কী লজ্জা !

তার চেয়ে আরও লজ্জার কথা আছে।

কী ?

ছেলেটাকে ঘরে বন্দী করে রাখাটাও কি লজ্জার কথা নয় !

ইশ ! তাই তো ! কী করা যায় এখন ! হেরোর মতন এখনই ঘরে ফেরাটা কি ঠিক হবে ? না, বেলা পড়লে যাবে ?

বেলা পড়লে যাবে কী ! তা হলে অতক্ষণ ছেলেটা না খেয়ে থাকবে ! কে জানে, কাল থেকেই ছেলেটা হয়তো উপোস করে আছে ! এই কথাটা মনে হতেই হো'র বুকটা কেমন যেন ধক করে উঠল। এখনই তো তা হলে ওর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে ঘরে ফিরতে হয় !

হো বাজারের দিকে হাঁটল। আজ তার সঙ্গে ব্যাঞ্জো নেই। সুতরাং তাকে যারাই দ্যাখে অবাক হয়ে চিৎকার করে, "হো-বুড়ো, হো-বুড়ো, তোমার এ কী অবস্থা ! গায়ে কোট

নেই, হাতে ব্যাঞ্জো নেই, কী হয়েছে ?"

এতক্ষণে হো'র খেয়াল হল, তাই তো, কোটটা তো সে গায়ে না দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে ! খাবার কিনবে কোত্থেকে ! পয়সা তো কোটের পকেটে ! হো'র সব মতলব গুবলেট হয়ে গেল। যারা চিৎকার করছিল তাদের দিকে শুকনো মুখে হো তাকাল। তারপর কাচুমাচু হয়ে বলল, "দ্যাখো বাবারা, বাড়িতে আমার অতিথি এসেছে। খাবার কিনব বলে বেরিয়ে এখন দেখছি কোটটাই পরা হয়নি।"

"কী ভুলো মন তোমার !" সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

"ভুলোই বটে। কোট রইল ঘরে, পয়সা রইল কোটের পকেটে, এদিকে আমি এসেছি আবার কিনতে। যাই, আবার ফিরে হাঁটি। পাপের শাস্তি আর কাকে বলে !" বলে, হো পিছু ফিরল।

হো-বুড়োকে ফিরতে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে একজন ডাক দিল তাকে। বলল, "হো-বুড়ো, আবার কষ্ট করে ঘরে ফিরবে কেন ? আমি তোমায় খাবার কেনবার পয়সা দিচ্ছি। কাল ভাল করে ব্যাঞ্জো শুনিয়ে শোধ করে দিও !"

হো খুশিতে উছলে চেঁচিয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই !" তারপর পয়সা নিয়ে, তাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে-দিতে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

খাবার নিয়ে বুড়ো যখন ফিরল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সারা পথটাই সে হাঁটতে-হাঁটতে ভেবেছে, ছেলেটার সামনে এই মুখ নিয়ে সে কেমন করে দাঁড়াবে ! কোন্ মুখে সে তার সঙ্গে কথা বলবে ! যাই হোক আর তাই হোক, একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘরের ভেতর অমন করে আটকে রাখাটা কি উচিত কাজ হল ! মনটা তার দগ্ধে দগ্ধে জ্বলে যাচ্ছে !

নিজের ঘরের সামনে এসে হো একটু দাঁড়াল। কী করবে এখন ? ভেতরে যাবে কি যাবে না, এই কথাটা ভাবতে-ভাবতে হো ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে চমকে উঠল। আরে ! এ কী ! ছেলেটা মাটিতে পড়ে আছে কেন ? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ! তাড়াতাড়ি দরজার তালাটা খুলে ফেলে, হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। এক পলক ছেলেটার দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেল ঘরের চেহারাটা দেখে। তকতক করছে চারদিক। এতদিন ঝুল আর ধুলোয় থিকথিক করত ঘরটা। সব সাফ ! দ্যাখো, দ্যাখো, হো'র ময়লা, ছেঁড়া বিছানাটা পর্যন্ত কেমন সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে ! ধুলধুলি, নোংরা-চিরকুট কোটটা ঝেড়েঝুড়ে কেমন টাঙিয়ে রেখেছে ! কাজটা যে কার, সে তো আর বুঝতে বাকি নেই হো'র। হঠাৎ কেন জানি, হো'র চোখ দুটিও ছলছলিয়ে ওঠে। বুঝি-বা আনন্দে ! সত্যি, মানুষ মানুষকে কেন এত ব্যথা দেয় ! কেন এত দুঃখ দেয় ! এত ভুল বোঝে ! হো'র মনে হল ছেলেটাকে সে এক্ষুনি জড়িয়ে ধরে আদর করে। বলে, তুই কিছু মনে করিস না বাবা। আমি বুড়ো হয়েছি। তাই মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি। শুধুমুধু তোকে কষ্ট দিয়েছি।

না, তা সে বলল না। ও এখন ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক। কাল সারারাত বাইরে ঘরের দোর-গোড়ায় পড়ে ছিল। হয়তো ভাল ঘুম হয়নি। আহা থাক, থাক, এখন একটু ঘুমুতে দাও ওকে !

হো সত্যিই ডাকল না। তার জন্যে দোকান থেকে সে ক'টা রসগোল্লা কিনে এনেছিল। ভাঁড়টা তার পাশে রেখে, কী মনে হল, ব্যাঞ্জোটা হাতে তুলে নিল। তারপর তারের ওপর খুব আলতো হাত বুলিয়ে, কী একটা সুর বাজাতে শুরু করল। খুব অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো দুলে ওঠা সেই সুর। হয়তো হো ভেবেছিল, সেই সুর হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ছেলেটার চোখে এই সুখের ঘুম আরও অনেকক্ষণ জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু বাজাতে-বাজাতে হো এমনই বিভোর হয়ে গেছল, কখন যে ছেলেটা উঠে পড়েছে, সে তার খেয়ালই হল না।

ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেছল আচমকা ওই ব্যাঞ্জোর সুরে। আচ্ছা আনমনা মানুষ তো হো-বুড়ো ! ছেলেটা যে বসে-বসে শুনছে তার বাজনা, সেটুকু দেখারও ফুরসত নেই তার ! বুঝি বা হো'র বুকের ভেতরটা এই মুহূর্তে, সুরের ছোঁয়ায় মাতোয়ারা !

হঠাৎ চমক ভাঙল হো'র। হঠাৎ বাজনা থামল। মুহূর্তে তার নজর পড়ল ছেলেটার দিকে। এ কী, ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেছে ! দেখতে-দেখতে চোখে চোখ পড়ে গেল ! হো ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ছেলেটা তাই দেখে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "থামলে যে ? আমার খুব ভাল লাগছিল।"

হো গম্ভীর।

ছেলেটা বলল, "বাব্বা ! কী গম্ভীর ! এই দেখলুম চোখ বুজে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে, হাসি-হাসি মুখ ! এখন কী হল আবার যে, মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল ! পুলিশ কই ?"

ছেলেটার এই কথা শুনে হো বিদ্যুতের মতো একবার শুধু তার মুখের দিকে দৃষ্টি হানল। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "সামনে রসগোল্লা !"

"কার ?"

"কার আবার, যার খিদে পেয়েছে।"

"কার খিদে পেয়েছে ?"

"এতক্ষণ যে ঘুমুচ্ছিল, তার পেয়েছে।"

এই কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "আমি আগেই জানতুম, তুমি খুব ভাল লোক।"

হো এবার একটু হালকা গলায় বলল, "ঠিক আছে। এখন খেয়ে নিয়ে আমাকে কেতাথ করো।"

ছেলেটা উত্তর দিল, "কই, আমার তো খিদে পায়নি !"

"জানতে পারি, রাত্তিরে কী খাওয়া হয়েছে ?"

"আমিও কি জানতে পারি, তুমিই বা রাত্তিরে কী খেয়েছ ?" ছেলেটা উলটে জিজ্ঞেস করে বসল।

"সে জমাখরচের তোমার দরকার নেই। যা বলা হচ্ছে, তাই করা হোক। পাশে নদী আছে। মুখ ধুয়ে এসে ভাঁড়টা খালি করে আমাকে রেহাই দাও !"

ছেলেটা এবার কোনও কথা না বলে ভাঁড়টার দিকে তাকাল। তারপর হাতে নিল। উঠে দাঁড়াল। হো'র কাছে এগিয়ে গেল। বলল, "খেতে পারি, যদি আমার কথা রাখো !"

"জানতে পারি, কথাটা কী ?"

"তোমাকেও খেতে হবে। আর আমাকে বাজনা শোনাতে হবে।"

হো ছেলেটার কথা শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, চুপ করে বসে রইল।

হো'কে চুপ দেখে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "তার মানে তুমি রাজি নও ! বেশ, তা হলে এই রইল রসগোল্লার ভাঁড়। আমি চললুম।"

সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, "না, যাবি না।"

তখন ছেলেটা বলল, "তা হলে খাও !"

অগত্যা হো বলল, "বেশ খাচ্ছি। কিন্তু একটার বেশি নয় !"

"বেশ তো, একটাই খাও !" বলে ছেলেটা নিজে ভাঁড় থেকে একটা রসগোল্লা বার করে হো'র মুখের কাছে ধরল। হো ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে রসগোল্লাটা সড়াত করে মুখে টেনে নিল। ক'ফোঁটা রস ছেলেটার হাতে ছিটকে লাগল। ছেলেটা হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "আমি তা হলে চট করে মুখ-চোখটা ধুয়ে আসি।" বলে ছেলেটা নদীর ঘাটে ছুটল।

ছেলেটা চলে গেল। হো সেই তক্কে রসগোল্লাটা চিবুতে-চিবুতে ভাবল, 'ছেলেটা যেমন মিষ্টি, তেমনি মিষ্টি রসগোল্লাটা। দোকানদার বেড়ে বানিয়েছে কিন্তু !'

ছেলেটা ঘরে ঢুকল। বলল, "নাও, এবার ব্যাঞ্জো বাজাও !"

হো অমনি সঙ্গে-সঙ্গে এবার নিজে রসগোল্লার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে বলল, "আগে তুই খেয়ে নে !" বলে, একটা রসগোল্লা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ছেলেটার মুখে তুলে দিল। ছেলেটা তার এতটুকু হাঁ-মুখে অত বড় রসগোল্লাটা পুরে ফেলে, না পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে। শেষে কোনওরকমে সামাল দিয়ে হাঁফ ছাড়ল। আর একটু হলেই বিষম লেগে যেত ! তারপর দাঁতের ফাঁকে বেশ কটা মোক্ষম চিবুনি দিয়ে বলল, "দারুণ খেতে কিন্তু !" তার পর নিজেই ভাঁড় থেকে আর একটা রসগোল্লা তুলে টপ করে মুখে ফেলে দিল। আঃ ! রস টুসটুক করছে !

তারপর আরও একটা।

শেষকালে যত ছিল, সব। ভাঁড় ফাঁকা ! হাতে যেটুকু রস লেগেছিল, চেটেপুটে তাও সাফা করে ফেলল।

হো ছেলেটার খাওয়ার রকমসকম দেখে আর থাকতে পারল না। ফোকলা দাঁতে ফ্যা-অ্যা-অ্যা, ফ্যা-অ্যা-অ্যা করে হেসে উঠল। ছেলেটাও হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, "আমি একটা রাক্ষস, না ?"

হো হাসতে-হাসতেই জিজ্ঞেস করল, "আর খাবি ?"

ছেলেটা বলল, "না। আর না। পেট ভরে গেছে।"

হো জিজ্ঞেস করল, "কী এমন খেলি যে, পেট ভরে গেল ?"

ছেলেটা উত্তর দিল, "এতদিন তো রসগোল্লা মিষ্টির দোকানের গামলাতেই ভাসতে দেখেছি। আজ পেটে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে পেট ভরে গেল।"

ছেলেটার কথা শুনে হো'র হাসিমুখ কেমন যেন চুপসে গেল।

ছেলেটা বলল, "এবার তা হলে হোক !"

"কী ?"

"ব্যাঞ্জো। বাজাও !"

"যদি না বাজাই !"

"তা হলে মনে করব, তুমি আমার সঙ্গে হুড়কুস্টি করলে !" বলে, ছেলেটা হো-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হো যেন একটু ব্যস্ত হয়েই বলল, "এই দেখেছিস, তোর নামটাই শোনা হয়নি !"

"নামটা আমার একদম শোনার মতো নয়।"

"তবু শুনি ?"

"না, শুনতে হবে না।"

"তবে ডাকব কী বলে ?"

"জানি না।"

"সে কী !"

"এখন আমি তোমায় নাম বললে, তুমি সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক জিজ্ঞেস করবে, কোথায় থাকি, বাবা কী করে, ক' ভাই, ক' বোন, নিজের বাড়ি, না ভাড়া বাড়ি, এমনি আরও সাত-সতেরো।"

"কেন, বললে দোষ কী ?"

এবার ছেলেটা একটু থামল। গলাটা তার ভার হয়ে গেল। তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "বলার কথা আমার কিচ্ছু নেই। কারণ আমার কেউ নেই !"

শিউরে উঠল হো, "কেউ নেই !" তারপর অপলকে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কতক্ষণই বা চেয়েছিল, হঠাৎ ছেলেটাই আবার হেসে উঠে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। তারপর বলল, "শোনো, শোনো, হো, আমার নাম, মন। আমার বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। আমি একা।"

"একা !" হো চমকে তাকায়।

মন নামে সেই ছেলেটা বলল, "তুমিও তো একা !"

"কে বলল ?" হো'র চোখের পাতা কেঁপে উঠল।

"বলেনি কেউ, নিজে দেখছি।"

একটু চুপ করে রইল হো।

মন জিজ্ঞেস করল, "চুপ করলে কেন ?"

হো উত্তর দিল, "এমনি।"

"ব্যাঞ্জো বাজাবে না ?" মনের আবার জিজ্ঞাসা।

"বাজাব," উত্তর দিল হো, "আমার বাজনা তোর ভাল লাগে ?"

"খুব ভাল লাগে। কতদিন তোমার পেছনে ঘুরে-ঘুরে কত শুনেছি।"

"এত শুনেছিস, তবে আরও কেন শুনতে চাস ?"

"এতদিন দূর থেকে শুনেছি। আজ তোমার কাছে বসে শুনব।"

"শিখবি ?"

ছেলেটার মুখের ওপর চকিতে যেন একটা ভয়ের ছায়া উঁকি দিল। ছেলেটা যেন আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, আমি ব্যাঞ্জো শিখব না, কিছুতেই না।"

হো মনের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন রে ?"

মন তেমনি ভয়ে-ভয়েই বলল, "সে-কথা জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি যদি বাজাতে পারো তো বাজাও, নইলে আমায় যেতে দাও।"

হো কী ভাবল কে জানে ! আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাঞ্জোটা হাতে তুলে নিল। তারপর বাজাতে শুরু করল।

অনেক, অ-নে-কক্ষণ বাজাল। তারপর যখন থামল, মনে হল, যেন অনেক ফুলের পাপড়িতে, অগুনতি মৌমাছি গুনগুন করে নাচতে-নাচতে এইমাত্তর আকাশে হারিয়ে গেল। দু'জনেই নিশ্চুপ। চারদিক নিথর।

অনেকক্ষণ পর ছেলেটাই প্রথম কথা বলল, "তুমি এত ভাল বাজাও কেমন করে হো ? তুমি জাদু জানো।"

হো একটু মুচকি হাসল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "মন, তুই আমার কাছে থাকবি ? এই ঘরে, আমার সঙ্গে ?"

হো-বুড়োর এই কথা শুনে মন নামে ওই ছোট্ট ছেলেটার চোখের সামনে যেন এক ঝলক খুশি পলকে উছলে পড়ল। আর একটু হলেই সে হয়তো চেঁচিয়ে উঠত, 'হ্যাঁ থাকব।' কিন্তু নিমেষে সে নিজেকে সামলে নিল। নিজের খুশিটাকে বুকের মধ্যে আগলে নিয়ে সে স্পষ্ট গলায় বলল, "না।"

"না কেন ?" হো সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল।

মন জবাব দিল, "আমি থাকলে তোমার কষ্ট হবে।"

বুড়ো হো মনের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "দূর বোকা, কষ্ট হবে কেন ? তুই আমার কাছে থাকলে, আমার ভাল লাগবে। তুইও একা, আমিও একা।"

"তারপর ক'দিন পরে আমার জ্বালায় যদি বিরক্ত হও ?" জবাব দিল মন।

হো বলল, "কী আর বিরক্ত করবি তুই ! যা দুটো জুটবে, দু'জনে ভাগ করে খাব। আর এই ঘরে দু'জনে ভাগাভাগি করে শোব।"

মন খানিক চুপ করে রইল। কিছু ভাবল। তারপর বলল, "যদিও থাকি, আমি এমনি-এমনি থাকব না। একটা কাজ দাও তো থাকতে পারি।"

"বেশ তো, আমি ব্যাঞ্জো বাজাব, তুই আমার সঙ্গে ঘুরবি। যারা আমার বাজনা শুনবে, তাদের কাছে আমার হয়ে পয়সা আদায় করবি।"

মন বলল, "রাজি।"

"তারপর আস্তে-আস্তে আমি তোকে ব্যাঞ্জোটা বাজাতে শিখিয়ে দেব। তুই বাজাবি।"

মন হো'র কথা শুনে, একইভাবে ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠল, "না। ও কথা বললে, আমি চলে যাব কিন্তু।" উত্তেজনায় কাঁপছে যেন ছেলেটা।

হো নরম গলায় আদর করে বলল, "শিখে রাখলে তোরই কাজে লাগবে।"

ছেলেটা এবার তিতিবিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, "বলছি তো, আমি শিখব না। কেন বারবার ওই কথা বলছ ?"

হো এবার অস্ফুট স্বরে বলল, "যা ভাল বুঝিস।"

সেইদিন থেকে মন নামে সেই ছেলেটা হো'র কাছে থেকে গেল। এতদিন দু'জনে ছিল একা-একা। এখন দু'জনেই দুটি সঙ্গী পেল। এখন দু'জনেই দুটো কথা বলে। দু'জনেই গল্প করতে করতে প্রাণ খুলে হাসে। হো পথে-পথে বাজনা বাজায়। আর মন পয়সা আদায় করে থলিতে ভরে নেয়। তারপর রাতে ঘরে ফিরে, দুটো খেয়ে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ে।

এমনি করে থাকতে-থাকতে দু'জনে দু'জনের বড় আপন

হয়ে গেল। এখন দু'জনেই জানে কেউ তারা একা নয়। হো যেন ভাবতেই পারে না, ছেলেটা তার নিজের ছেলে নয়। আর মনও জানে হো তার আপনজন, কাছের মানুষ। ছেলেটা, যে কোত্থেকে এল, না-এল, এ-কথা যেমন হো কোনওদিন ভাবেনি, মনও তেমনি হো কে ছিল, না-ছিল এ-নিয়ে মাথা ঘামায়নি। হো'র শুধু একটাই দুঃখু, ছেলেটাকে সে ব্যাঞ্জোটা শেখাতে পারল না। ছেলেটা শুনবে, তবু শিখবে না। শেখার নাম শুনলেই মাথায় বাজ পড়ে। কেন ? উত্তর পায় না হো।

বেশ চলছিল। হঠাৎ হল কী, হো একদিন খুব বৃষ্টিতে ভিজল। বয়স হলে যা হয়, সর্দি-কাসি, জ্বর-জ্বালা। সে যে তা বলে ইচ্ছে করে ভিজেছে, তা মনে কোরো না। মনে কোরো না যেন, বাচ্চারা যেমন বৃষ্টির জলে ভিজে-ভিজে নাচানাচি করে, হো-ও তেমন ভিজে-ভিজে নেচেছে। সেদিন পথের মাঝে হঠাৎ ঝড় উঠল, ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আর এমন বরাত, কাছেপিঠে মাথাটা বাঁচাবার মতো একটাও জায়গা জুটল না তার ! অগত্যা ভিজল। ভিজে ঢোল হয়ে যখন ঘরে ফিরল, তখন 'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ' শুরু হয়ে গেছে। বুকে সর্দি বসল। আর রাত না-পোয়াতেই 'হি-হি' করে জ্বর এল। গা একেবারে আগুন ! বেচারা না পারে উঠতে, না কিছু করতে।

একদিন গেল, জ্বর ছাড়ল না।

দু'দিন গেল, জ্বর ছাড়বে কোথায় ! বাড়ল।

তিনদিনের দিন হো একেবারে কাহিল।

মন তো ভীষণ বিপদে পড়ল। সে তো ছোট্ট। কী করবে সে, কিছুই ভেবে পায় না। তার ওপর যে'কটা পয়সা ছিল, এ-ক'দিনে সব খরচ হয়ে গেছে। বসে-বসে খরচ করলে যা হয় ! এক পয়সা আয় নেই, দু পয়সা খরচ। এখন কী হবে ? এক্ষুনি যে একজন ডাক্তার ডেকে এনে হো'কে দেখানোর দরকার, সে-কথাটা মন হাড়ে-হাড়ে বুঝলেও সামর্থ্য নেই। কী ফ্যাসাদ বলো। মানুষটা কি শেষে ওষুধ-পথ্যির অভাবে চোখ বুজবে ! ছেলেটার ভয়ে মুখ শুকিয়ে এইটুকুনি। সে একবার এদিকে যায়, একবার বাইরে ছোটে। কিন্তু তাতে কী হবে।

শেষে হো তার এই অবস্থা দেখে তাকে কাছে ডাকল। খুব কষ্ট করে জিজ্ঞেস করল, "কী রে ? পয়সা ফুরিয়ে গেছে ?"

মন কোনও উত্তরই দিতে পারল না।

হো আবার তেমনি কষ্ট করে জিজ্ঞেস করল, "কী হবে তা হলে ?"

এবার মন কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর দিল, "জানি না।"।

হো বলল, "দ্যাখ দিকিনি, ব্যাঞ্জোটা শিখে রাখলে তো আর এমন বিপদে পড়তে হত না তোকে।"

এবার কিন্তু মন চুপ করে থাকল। রাগল না। বিরক্ত হল না।

হো ছেলেটাকে অমন চুপ থাকতে দেখে, আবার জিজ্ঞেস করল, "তা হলে এখন কী হবে ?"

তবু কোনও উত্তর দিল না মন। ওর চোখ ছলছল করছে।

হো জিজ্ঞেস করল, "কী করবি এখন ? ভিক্ষে ?"

মন এবার চমকে চাইল। চোখের জলটা মুছে বলল, "ভিক্ষে করতে যাব কোন্ দুঃখে।"

"তবে ?"

"দেখি।"

"কবে দেখবি ? আমি মরে গেলে ?"

শিউরে উঠল মন। আহা রে, সত্যিই, মানুষটার কী চেহারা হয়েছে এই ক'দিনে ! চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। কপালে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি হো মরে যাবে ! বেশিক্ষণ হো'র মুখের দিকে চাইতে পারল না মন। যেটুকু চোখের জল একটু আগে মুছেছিল, সে-জল আবার ছলছলিয়ে উঠল। তারপর যখন চোখ বেয়ে উপচে পড়ল, তখন মন হো'র বুকের মধ্যে নিজের মুখটা লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে ফেলল।

মনকে অমন করে কাঁদতে দেখে হো তার শীর্ণ হাতটা অনেক কষ্টে তার মাথায় রাখল। আদর করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোর খুব খিদে পেয়েছে, না রে ?"

মন সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "তোমায় আমি মরতে দেব না হো। তুমি আমার সব। তুমি চলে গেলে কে আমায় ভালবাসবে !"

"একদিন তো মরতে হবে।" হো'র মুখে অস্পষ্ট কষ্টের হাসি।

"আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখব।" মনের গলায় সে কী দৃঢ়তা।

"কেমন করে ?" জিজ্ঞেস করল হো।

"যেমন করে পারি।" উত্তর দিল মন।

হো তেমনি ধীরে-ধীরে মনের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "আমি বেঁচে থাকতুম, যদি তুই ব্যাঞ্জোটা আমার কাছে শিখে নিতিস।"

এবার যেন আকুল হয়ে মিনতি করল মন, "তুমি আমায় ও-কথা বোলো না হো, ও-কথা বোলো না। আমার কষ্ট হয়।"

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

বোর্নভিটা — মল্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, যাতে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবেরি— ১০০ বছরেরও ওপর যারা পানীয় আহার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ।

প্রতি কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নভিটা মিশিয়ে খেলে, পরিবারের প্রত্যেকে পাবে পুষ্টি ও আস্বাদে ভরা এক পানীয়। বোর্নভিটা বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে ওদের দিনে দুবার বোর্নভিটা দিন— আর লক্ষ্য করুন, শরীর বৃদ্ধির উপযোগী যথাযথ শক্তি পেয়ে ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ছে!

বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীলা এক মা বলেন ঃ "আমার বাচ্চাদের দুধে বোর্নভিটা মিশিয়ে খাওয়াই বলে, ওরা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর শক্তি যথাযথভাবে পায় —তাইতো পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হবেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ম.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

OBM/5135/BEN

হো এবার করুণ স্বরে বলল, "বেশ, আর বলব না, কোনও দিনও বলব না। শুধু একটা কথা বলি, তুই চোখের জল ফেলিস না। আমি দেখতে পারি না।"

হো'র বুক থেকে নিজের মাথাটা তুলে নিল মন। চোখ মুছল। তারপর বলল, "হো, তুমি শুয়ে থাকো, আমি তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে আসি।"

হো ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে আনবি?"

মন বলল, "এতদিন তুমি কত লোককে বাজনা শুনিয়েছ। কত লোক তোমায় চেনে। তোমায় সক্কলে ভালবাসে। যাকে বলব, দেখবে সে-ই ওষুধ কিনে দেবে!"

হো হাসল।

মন বলল, "আমি তা হলে যাই!"

"তাড়াতাড়ি আসবি।"

"হ্যাঁ, যাব আর আসব।" বলে, মন ছুট দিল।

ছুটতে-ছুটতে মন একেবারে সটান বাজারে চলে এল। আর ওদিকে হো একলা ঘরে শুয়ে-শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

বাজারে অনেক লোক। অনেক লোকের কত লোককে মন চেনে। মন ভাবল, ওদের বললে, নিশ্চয়ই কাজ হবে। তাই মন প্রথমজনের কাছে ছুটে গেল। বলল, "শুনুন, হো-বুড়োর অসুখ করেছে। ওষুধ কেনার পয়সা নেই। আপনি..."

মনের কথা শেষ হল না, লোকটা নাক উঁচিয়ে চলে গেল।

মন আর একজনের কাছে গেল। তাকেও ওই একই কথা বলল। লোকটা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

আর একজন মুখ টিপে হাসল।

কেউ কেউ ঠাট্টা করল। টিটকিরি দিল।

একজন বলল, "বুড়ো হলে মানুষ মরবে না! মরতে দাও, মরতে দাও! মানুষটা শান্তিতে মরুক।"

মন আকুল হয়ে বলল, "এতদিন সে তোমাদের বাজনা শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছে। আজ সে উপোস করে মরতে বসেছে। তোমরা কি তার জন্যে কিছু করতে পারো না?"

মনের কথা শুনতে বয়ে গেছে তাদের। চলে গেল।

মন থ হয়ে যায়। মানুষ কী স্বার্থপর, নিষ্ঠুর। ভয়ংকর স্বার্থপর এক দানবের গল্প শুনেছিল মন অনেকদিন আগে। তার মনেও দয়া ছিল। কিন্তু মানুষ এত নির্দয়!

কেমন যেন নিরাশ হয়ে যায় মন। আর যেন পা চলছে না তার। বড্ড ক্লান্ত সে। তবু মনটাকে অনেক শক্ত করে এতক্ষণ হেঁটেছে। এখন যেন আর পারছে না। এদিকে বেলাও পড়ে যাচ্ছে। অথচ শূন্য হাতে সে কেমন করে হো'র সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে কি সে-ই ভুল করল! তবে কি হো'র কথামতো সে ব্যাঞ্জোটা বাজাতে শিখলে এত কষ্ট হত না হো'র! কী যে করবে, সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ভাবতে-ভাবতে।

আর দাঁড়াতে পারছিল না মন। বিকেলের পড়ন্ত রোদের ছায়ায় একটা অর্জুন গাছের নীচে সে বসে পড়ল। এখন মাথায় তার কিচ্ছু বুদ্ধি আসছিল না। দেহের মতো মাথাটাও তার ঝিমঝিম করছে। ছিঃ, ছিঃ, যে-মানুষটা তাকে এত ভালবাসে তার কেন অবাধ্য হল মন! কেন সে শিখল না ব্যাঞ্জোটা! না-জানি কত দুঃখ পেয়েছে মানুষটা!

দুঃখ কি মনেরও কম! সে কেমন করে তার হো'কে বোঝাবে যে, সত্যিই ওই বাজনাটা বাজাবার কথা বললে তার ভয় লাগে! কেননা, এই বাজনাটার জন্যেই মনের সব কিছু হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মা, তার বাবা, তাদের সেই ছোট্ট বাড়িটা, সব কিছু। মনের বাবাও ছিল হো'র মতো এক মস্ত **বাজনদার**। ওর বাবাও বাজাত ব্যাঞ্জো। ওদের বাড়িটা ছিল নদীর ধারে। ওরা ছিল নদীর মানুষ। প্রত্যেক বছর বর্ষার শেষে যখন ফসলের চারাগুলি রোদের ছোঁয়ায় সোনা-রঙে দুলে উঠত, তখন নদীর ধারে, দূর এক গ্রামে মেলা বসত। ওই মেলায় কত রকমের পসরা নিয়ে মানুষ যেত বিকিকিনি করতে। যেত মন, তার মা, বাবাও। নদীতে নৌকো ভাসত। ঢেউ উঠত। সেই ঢেউয়ে দুলে-দুলে মনের বাবা ব্যাঞ্জো বাজাত, মা গান গাইত। সে গান ছিল নদীর গান। সেই সুর বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে দূর থেকে দূরে, আরও দূরে ভেসে যায়! আঃ! সে কী খুশির সুর!

কিন্তু এক বছর হল কী, এমনি করে যেতে-যেতে মাঝদরিয়ায় হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। তুফান উঠল, বাজ পড়ল, তারপর ভয়ংকর ঝঞ্ঝায় তাদের নৌকো জলের নীচে তলিয়ে গেল। কে যে কোথায় গেল, কেউ জানে না। কে মরল, কে বাঁচল তার খবর কে রাখছে তখন!

কিন্তু মন বেঁচে গেল। কেমন করে বাঁচল, সে নিজে আজও তা জানে না। তাকে পাওয়া গিয়েছিল নদীর চরে। হয়তো ঝড়ের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে লড়াই করতে-করতে সে জিতে গিয়েছিল। কিন্তু এ-জয়, তার মুখে হাসি ফোটায়নি। কেননা, সেদিন থেকে সে মাকে হারিয়েছে, বাবাও নেই। পৃথিবীতে মন একা। কেবলই একা। তারপর থেকেই তো ওই ব্যাঞ্জোকে তার ভীষণ ভয়। ওর মন শুধু শুনতে চায় এই বাজনার সুর। শুধু শুনবে। শুনতে শুনতে ও যেন দেখতে পায় বাবাকে, অস্পষ্ট বাবার মুখখানি! কিংবা মায়ের চোখ দুটি! কিন্তু ভাবে, ওই ব্যাঞ্জো বাজাতে-বাজাতেই তো ঝড় উঠেছিল, ওই ভয়ংকর ঘূর্ণি হাওয়া! হো'কে তার এই দুঃখের কথাটা কত দিন বলতে গিয়েও বলতে পারেনি মন। যদি মানুষটা ব্যথা পায়! ওই বুড়ো মানুষটাও যে একা!

গাছের নীচে বসে-বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মন। বেলা যে কখন সাঁঝের বেলায় গড়িয়ে গেছে, সে তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন পাখিরা গাছে ফিরে গেছে। আকাশে একটি-দুটি তারা ফুটেছে। হয়তো আর একটু পরেই আঁধার ছেয়ে যাবে। বুকটা ধক্ করে উঠল মনের। ছিঃ, ছিঃ! এ কী! সে ঘুমুচ্ছে! প্রায় লাফিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। ব্যস! সঙ্গে-সঙ্গে ঠুং-ঠাং, ঝনাত্! শিউরে উঠল মন। কিসের শব্দ! কী পড়ল! সেই আলো-আঁধারিতে চোখ মেলে সে চমকে গেল, আরে, এ যে টাকা! তারপর সে চিৎকার করে উঠল, "টাকা!" কে দিল? কোত্থেকে এল? নিশ্চয়ই কোনও দয়ালু মানুষ তাকে এমন করে গাছের নীচে পড়ে থাকতে দেখে দিয়ে গেছে! টাকাগুলো সে গুনতে শুরু করল, একটা, দুটো তিনটে, চারটে, ছটা, দশটা, অনেক টাকা। মনের বুকের ভেতরটা খুশিতে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। ক্লান্ত পা দুটো তার হঠাৎ যেন হরিণের মতো ছুটতে চায়। সে ছুটল। কিছুটা ছুটেই একটা ডাক্তারখানা দেখতে পেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমার হো-বুড়োর সর্দি-জ্বর। একটু

ওষুধ দিন না, আমি পয়সা দেব !"

ডাক্তারবাবু সর্দি-জ্বরের ওষুধ দিলেন। পয়সা নিলেন। ওষুধ হাতে নিয়ে মন তীরের মতো ছুটতে লাগল।

ছুটতে-ছুটতে একেবারে হো'র ঘরের সামনে। দরজা ঠেলে চেঁচিয়ে উঠল, "হো-বুড়ো, হো-বুড়ো, তোমার ওষুধ এনেছি !"

হো সাড়া দিল না।

মন আবার চেঁচাল, "হো, তুমি ঘুমুচ্ছ ? তোমার ওষুধ !"

তবু সাড়া দিল না।

হো'র মুখের কাছে মন হুমড়ি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "হো ওঠো ! ওষুধ খাও !"

তবু নিশ্চুপ।

মন তখন হো'র বুকে হাত রেখে ঠেলা দিল। তারপর থতমত খেয়ে গেল। মনের হাতটা কেঁপে উঠল। ওষুধটা হাত ফশকে মাটিতে ছিটকে পড়ল। এ কী ! হো'র নিস্তেজ বুকটা এমন বরফ-ঠাণ্ডা কেন ? চোট দুটো তার বুজে আছে। মুখখানি শান্ত !

মন হতবাক। সেই অন্ধকার ঘরে সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হো'র বুকে মাথা রাখল। অস্ফুট স্বরে বলল, "তোমার কথা শুনিনি, তাই বুঝি আমার ওপর রাগ করে চলে গেলে ! আমি তোমার কথা রাখব হো। তুমি ফিরে এসো। বিশ্বাস করো আমি ব্যাঞ্জো শিখব। তুমি যা বলবে, তাই করব।" বলতে-বলতে মন হো'র সেই বরফ-ঠাণ্ডা নিস্তেজ দেহটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু হো আর সাড়া দিল না।

কথা রেখেছিল মন। হো'র সেই ব্যাঞ্জোটা বুকে নিয়ে হারিয়ে গেল, অন্য আর-এক অজানা দেশে। যেন কেউ না খুঁজে পায় তাকে। নির্জন এক বনের গভীরে ঘুরে বেড়ায়। যেন কিছু একটা খুঁজে বেড়ায়। যেখানে অনেক পাখি গান গায়, কিংবা হাওয়ার দোলায় গাছের পাতারা যেখানে ঝিলমিলিয়ে নাচে, বা একটু দূরে পাথরের ওপর নাচতে-নাচতে ঝরনার জল গড়িয়ে যায়, সেখানে সে দাঁড়ায়। সুন্দর ওই পাখি, এই ফুল, এই গাছ আর ঝরনা দেখতে-দেখতে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। একটি পাথরের ওপর সে বসে। তারপর ব্যাঞ্জোর তারে আলতো হাতের স্পর্শ দেয়। ওই পাখির গান সে বাজাবার চেষ্টা করে।

পারে না।

ওই হাওয়ার ঝিলিমিলি ?

তাও বাজে না সেই তারে।

ঝরনার টুং টাং ?

বাজনায় সুর পায় না।

একদিন পারে না।

দু'দিন পারে না।

তিনদিনও না।

তবে কি মন কোনওদিনই পারবে না ? ভাবতে-ভাবতে ছটফট করে মন। তবে কি হো'কে মন যে-কথা দিল, সে-কথা তার মিথ্যে হয়ে গেল ? তা হলে এখন কী করবে সে ? সে কি চলে যাবে এই বন ছেড়ে ? নাকি, এই বনে বনেই সে ঘুরবে। ঘুরতে-ঘুরতে চলে যাবে সেখানে, যেখানে তার হো-বুড়ো চলে গেছে ? মন ভাবে আর কাঁদে। কাঁদে আর ব্যাঞ্জোর তারে হাত বুলোয়।

কিন্তু একদিন হঠাৎই এক আশ্চর্য জাদু কে যেন ওর হাতে ছুঁইয়ে দিল। কে যেন তার হাতটি ধরে তারে তারে সুর তুলে দেয় ! মনের গায়ে যেন শিহরন লাগে। আপনমনে বাজিয়ে চলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো !

বাজায় ! বাজায় ! বাজায় !

তারপর ?

সে চিৎকার করে ওঠে আনন্দে, "আমি পেরেছি। হো, শোনো, আমি পেরেছি।" আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে-কাঁদতে চোখ তার উপচে যায় অসংখ্য অশ্রুফোঁটায়। তবু সে বাজনা থামায় না। ঝরনার টুং টাং, পাতার ঝিলমিল আর পাখির কলতান সব যেন একসঙ্গে বেজে ওঠে তার ব্যাঞ্জোর তারে।

হঠাৎ সে থামে। চোখের জল সে মুছে ফেলে। তারপর সেই অজানা দেশের গভীর অরণ্য থেকে সে ছুট দেয়। ছুটতে-ছুটতে সে বন পেরিয়ে এগিয়ে চলে বসতির দিকে। সে খুঁজে বেড়াবে হো'র সেই ছোট্ট ঘরখানা। তারপর সেই ঘরে সে বাসা বাঁধবে। অন্ধকার রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, নিঝুম হয়ে যাবে চারদিক, তখন সেই ঘরে একলাটি বসে-বসে বাজনা বাজাবে মন। তখন হয়তো হো স্বর্গ থেকে নেমে এসে তার বাজনা শুনবে। হয়তো খুশিতে হেসে উঠবে, "হা-হা-হা।" সেই প্রাণখোলা হাসি।

কিন্তু এ কী ! হো'র সেই ছোট্ট ঘরখানা কোথায় গেল ? এই তো এইখানে ছিল। এখন নেই তো ! ওই দূরে দেখা যাচ্ছে নদী। ওই তো কিছু গাছ, কিছু ঝোপ নদীর ধারে, তেমনি আছে। কী হল বলো তো ? কেউ কি ভেঙে দিল ! সে উত্তর মন পেল না। দুঃখ হল বটে, তবে মুষড়ে পড়ল না। সে থামাল না তার বাজনা। সে যে হো'র কথা রেখেছে। আর থামবে না, কোনও দিনই না।

ব্যাঞ্জো বাজিয়ে হো'র মতনই পথে পথে ঘুরে বেড়ায় মন। তার হো'কে বাঁচাবার জন্যে যাদের কাছে আকুল হয়ে ঘুরেছে মন, সেই মানুষের দলই আজ তার বাজনা শোনে। আনন্দে উল্লাস করে। আর মন হাসে। ভারী তাচ্ছিল্য-ভরা সে হাসি। কেননা, সে জানে, আজ যারা তাকে নিয়ে মাতামাতি করছে, যেদিন হো'র মতো সে-ও অথর্ব হয়ে যাবে, সেদিন আর এরা তাকে চিনতে পারবে না। একটা ভাঙা পুতুলের মতো জঞ্জালে ফেলে দেবে।

আশ্চর্য, যতই দিন যায়, মনের বাজনার সুর যেন ততই মানুষকে চমকে দেয় ! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মন নামে এই আজব ছেলের বাজনার গল্প। মানুষের মুখে-মুখে রটে যায়, ছেলেটা সুরের জাদুকর। যাদের নাম ছিল ওস্তাদ-বাজিয়ে বলে, যাদের অনেক আদর ছিল, তাদের টনক নড়ল। হিংসায় চোখ তাদের বেঁকে যায় ! বাঁকা চোখে তারা আস্ফালন শুরু করে, "কী, একটা কালকের ছেলে, তাকে নিয়ে এত নাচানাচি।" সুতরাং যত রাজ্যের কুমতলব তাদের মাথায় চাগাড় দিল। তারা মনকে শাসাল, "ওহে ছেলে, এখনই তুমি বাজনা ছাড়ো, নইলে তুমি শেষ হয়ে যাবে।"

মন উত্তরে বলল, "মাননীয় ওস্তাদজি, যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমার বাজনা বাজবে। এই দুনিয়ায় এমন

কেউ নেই, যে আমার বাজনা বন্ধ করতে পারে। হ্যাঁ, আমি বাজনা ছাড়তে পারি, কেউ যদি আমার চেয়ে ভাল বাজনা বাজিয়ে আমাকে হারাতে পারে। শুনে রাখুন আপনারা, আমার হাতের এই ব্যাঞ্জো আমার হো-বুড়োর। সুতরাং সহজে আমি হারতে জানি না।"

ওস্তাদজিরা হেসে উঠল মনের কথা শুনে। ঠাট্টা করে বলল, "ওরে খুদে ওস্তাদ, আমাদের নখের যোগ্য হয়ে ওঠ আগে, তারপর কথা বলবি! এখনও হাতের আড় ভাঙেনি, তবু দেমাক দ্যাখো।"

মন বলল, "সাহস থাকে তো আসুন আমার হাতের আড় ভেঙেছে কি না একবার দেখে যান।"

"তবে আয়!" বলে সত্যিই সেই ওস্তাদের দল নিজেদের তারে সুর বাঁধল।

হাজার-হাজার লোক জমায়েত হল, সেই আজব ছেলের জাদুকরি বাজনার লড়াই দেখার জন্যে। তাবড়-তাবড় ওস্তাদের কেরামতি দেখে, একটুও ঘাবড়াল না মন। সে আপন মনে বাজায়। আর এক-এক ওস্তাদ রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেগে যায়।

একজন ভাগে তো, হাজার-হাজার মানুষ চিৎকার করে।

দুজন হারে তো, 'শাবাশ, শাবাশ' করে তারা আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে।

শেষকালে যখন হেরে মাথা নিচু করে পালাল, তখন সেই অসংখ্য লোক মনকে মাথায় নিয়ে, কোলে তুলে, বুকে জড়িয়ে উল্লাসে নাচানাচি শুরু করে দিল।

তখন এল শেষজন। শেষজন বুঝি ওস্তাদের ওস্তাদ। সব সেরা। শেষজনের শেষ বাজনায় মনের বুক উত্তেজনায় কাঁপে। লোকটাকে কেমন যে দেখতে, একবার ফিরে দেখার ফুরসতও পেল না মন। সে বাজায় আপনমনে। এক-একটি সুরে মনের ব্যাঞ্জোর তার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে অগুনতি লোক 'আহা আহা' করে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওস্তাদের ওস্তাদ সেও তো কম যায় না! মন যে সুর বাজায়, ওস্তাদ বাজায় তারও ওপরের সুর। একবার মন বাজায়, একবার ওস্তাদ বাজায়। সে কী জমজমাট সুরের ঝঙ্কার। কে যে হারবে কেউ জানে না। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়।

ঝনাত্।

কিসের শব্দ?

তার ছিঁড়ে গেল।

অসংখ্য মানুষ 'হায় হায়' করে উঠল। ইশ্, ছেলেটা কি শেষ অবধি হেরে গেল!

না, না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, ব্যাঞ্জোর তার ছিঁড়েছে বড়-ওস্তাদের?

"কই?"

"তাই তো।"

ওঃ! তখন সে কী আনন্দের চিৎকার। মনকে নিয়ে জনতা প্রায় লোফালুফি শুরু করে দিল। ছেলেটার প্রাণ বুঝি যায়!

বড়-ওস্তাদ উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল মনের কাছে। হাত বাড়াল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই দু'জনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দুজনেই হতবাক। দুজনেই নিশ্চল।

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠে মন সেই বড়-ওস্তাদের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে শুধু একটি শব্দই বেরিয়ে এল, "বাবা!"

উল্লাসে মত্ত অত লোক নিমেষে নিশ্চুপ। অবাক তারা।

বড়-ওস্তাদের বুকের ভেতরে একটা আনন্দের ঢেউ বারবার আছড়ে পড়ে আকুলি-বিকুলি করে উঠছে, "আমার ছেলে, আমার ছেলে।"

এখন বাবা আর ছেলে দু'জনের চোখেই জল। দু'জনেই এখন বুঝতে পারল, সেই নৌকাডুবিতে দুজনেই বেঁচে গেছে। কিন্তু মা?

অগুনতি লোক সেই দৃশ্য যখন অবাক হয়ে দেখছিল, তখন বড়-ওস্তাদ চেঁচিয়ে উঠে তাদের বলল, "শুনুন বন্ধুগণ, আপনাদের এই খুদে-ওস্তাদ আমার ছেলে। অনেকদিন আগে এক নৌকাডুবিতে আমরা জলে ভেসে যাই। আমি আর আমার বউ সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা থেকে কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছিলুম। কিন্তু এতদিন আমরা জানতুম, আমাদের ছেলে বেঁচে নেই। আজ হঠাৎ তার দেখা পেয়েছি, আপনাদেরই জন্যে। সুতরাং ছেলের কাছে আমার এই পরাজয় লজ্জার নয়, আনন্দের।"

তখন সেই মানুষের দল, চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে আনন্দে নেচে উঠল। তারা বলল, "আপনার ছেলের মুখখানি আমরা একবার দেখতে চাই!"

সত্যিই মনের মুখখানি তখন দেখাই যাচ্ছিল না। কারণ তখনও তার মুখখানি ওর বাবার বুকের মধ্যে লুকনো ছিল।

তারপর বুকের ভেতর থেকে মন মুখখানি বার করে আনল। তার চোখ-ভর্তি জল। সে জনতার দিকে হাত তুলল। তার চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে। এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে জনতারও যেন চোখ ছলছল করে ওঠে। তারাও খুদে-ওস্তাদের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, "শাবাশ।"

মন আকাশের দিকে চাইল। ওই তার হো'র স্বর্গ। ওই বুঝি তার হো আকাশ থেকে উঁকি মারছে। হাসছে। আঃ! কী নরম সেই হাসি!

আকাশ থেকে চোখ নামাল মন। তারপর বাবার মুখের দিকে তাকাল। হাত ধরল। হাঁটল। বাবার হাত ধরে ফিরে চলল ঘরে, তার মায়ের কাছে।

ছবি : প্রবীর সেন

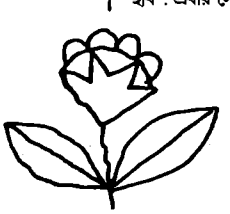

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব ছৈ ছৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

সদাশিব গুটিগুটি নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে।
এত লোকের সঙ্গে তো গায়ের জোরে সে পেরে উঠবে না, বুদ্ধিবলে জিততে হবে। তাই কাঁদো-কাঁদো মুখ করে শুধোল—

জবাব দেবার আগেই একজন সদাশিবের ঘোড়াটা কেড়ে নিল। অন্য সবাই ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল গুহার মধ্যে।

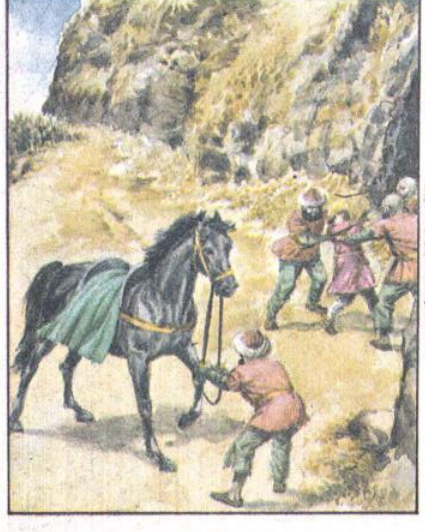

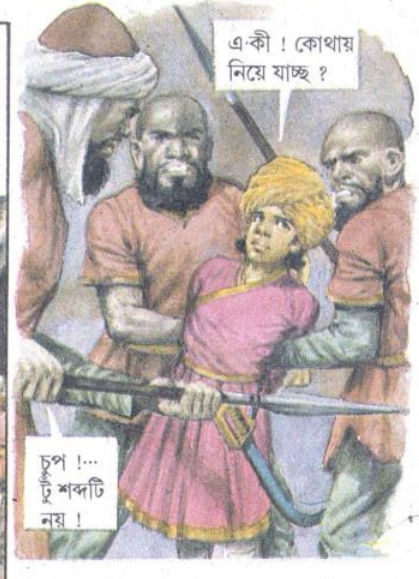

গুহার ভেতরটা ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। পাথরের ফাটল বেয়ে ঝিরঝির করে এখানে-ওখানে জল পড়ছে।

ওদিকে, যে লোকটা ঘোড়া কেড়ে নিয়েছিল, চটপট ঘোড়াটার রাশ খুলে তার পায়ে ছাঁদন-দড়ি বেঁধে দিল।

গুহার মধ্যে টেনে এনে ডাকাতদের একজন সদাশিবকে বলল—

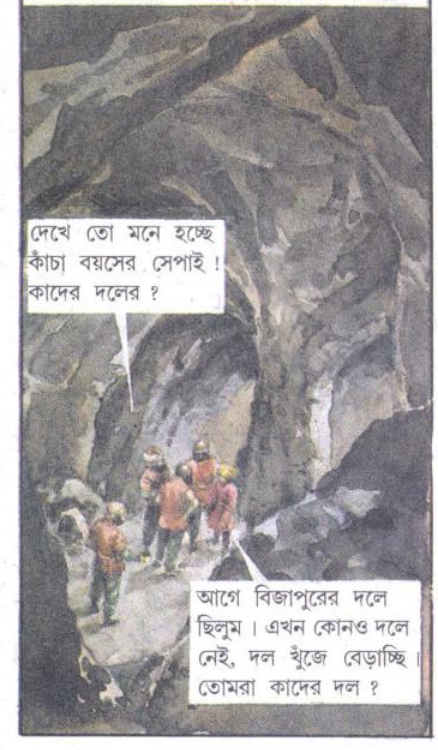

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **অনিত্রা রায়** (বয়স ৬)

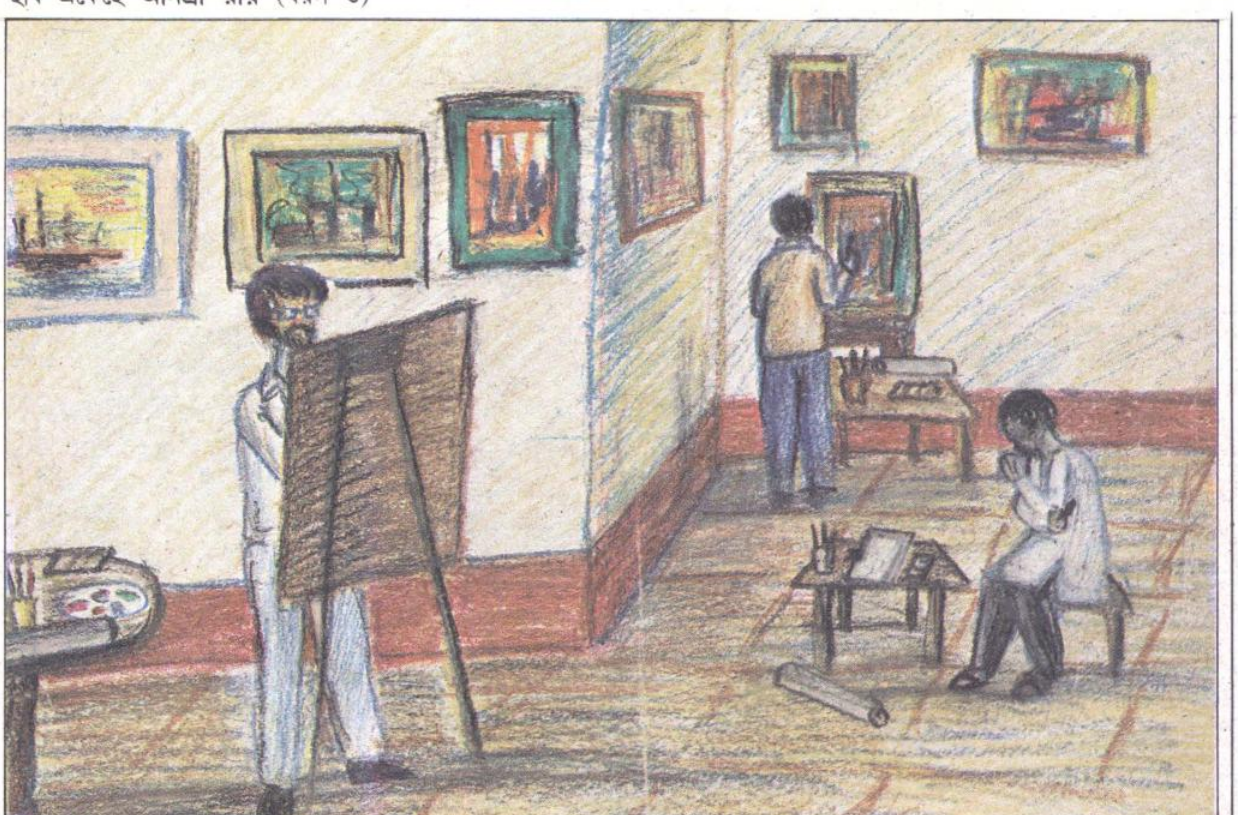

ছবি এঁকেছে **সৌম্যব্রত বসু** (বয়স ১৪)

সবই ভাল, শুধু—

এবার শীতের ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলাম মামার বাড়ি বেড়াতে। একদিন আমার মামা আমাকে আর ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন মেট্রোরেল চড়াতে। মাটির নীচে দিয়ে ট্রেন যায় ভাবতেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, খুব উৎসাহ নিয়ে গেলাম।

ভবানীপুর থেকে ট্রেনে উঠব। স্টেশনে ঢুকে দেখি কী সুন্দর সব ব্যবস্থা! সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তকতক করছে। চারদিক আলোয় ঝলমল। নোংরা কাগজ বা ট্রেনের টিকিট ফেলার জন্য বড়-বড় বালতি আছে।

একটু পরে ট্রেন এল। থামতেই আপনাআপনি ট্রেনের দরজা খুলে গেল। আমরা ট্রেনে উঠলাম। খুব সুন্দর ট্রেনের কামরাগুলো। ট্রেন যেই ছাড়ল অমনি দরজাগুলো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল।

মেট্রোরেলের ব্যবস্থাপনা দেখে আমার বারবারই বিদেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানি গিয়েছিলাম। সেখানে সবকিছুই এইরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ট্রেনের বা ট্রামের দরজাগুলো এইভাবে বন্ধ হতে ও খুলতে দেখেছি। লণ্ডনে এবং প্যারিসে মেট্রোরেলেও চড়েছি। তবে ভাল মনে নেই। মনে আছে লণ্ডনে লিফ্‌টে করে অনেক নীচে নামতে হয়েছিল মেট্রোরেলের স্টেশনে যাবার জন্য।

যাই হোক, আমাদের ট্রেনটা ভবানীপুর থেকে রওনা দিয়ে মাঝখানে তিনটে স্টেশনে থেমে মাত্র সাত মিনিটে ধর্মতলা পৌঁছে গেল। কী চমৎকার স্পিড। খুব ভাল লাগল।

ধর্মতলায় যখন নামলাম তখন একটা জিনিস লক্ষ করে অবাক হয়ে গেলাম। কিছু প্যাসেঞ্জার আগে থেকে বসে ছিল, তারা কিন্তু ধর্মতলাতেও নামল না। ট্রেনে বসে থাকল। একটা দিকের টিকিট কেটে এভাবে ট্রেনে বসে থাকার অর্থ আমি খুঁজে পেলাম না। অযথা ট্রেনে এরা ভিড় বাড়াচ্ছে বলেই আমার মনে হল। অনেকে এই ভিড়ের জন্য ট্রেনে উঠতেই পারছে না। মেট্রোরেলের সবই ভাল, শুধু এই দিকটা ছাড়া।

ধৃতি দে (বয়স ১৫)

ছবি এঁকেছে **শুভ্রশঙ্খ গুহরায়** (বয়স ১১)

একলা যাযাবর

অনেক দিন ধরে
অনেক দেশ ঘুরেছি,
অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি,
আজ আমি ক্লান্ত।

মনে পড়ে, সেই সবুজের দেশ,
সেই মরুভূমি।
এই পৃথিবীতে কেউ নেই আমার।
একা-একা ঘুরে বেড়াই।

আমি ছিলাম এক পথিকের সঙ্গী।
এখন আমার কেউ নেই।
আজ আমি শুধু শান্তি চাই,
আর-কিছু চাই না।

অনিরুদ্ধ রায় (বয়স ১২)

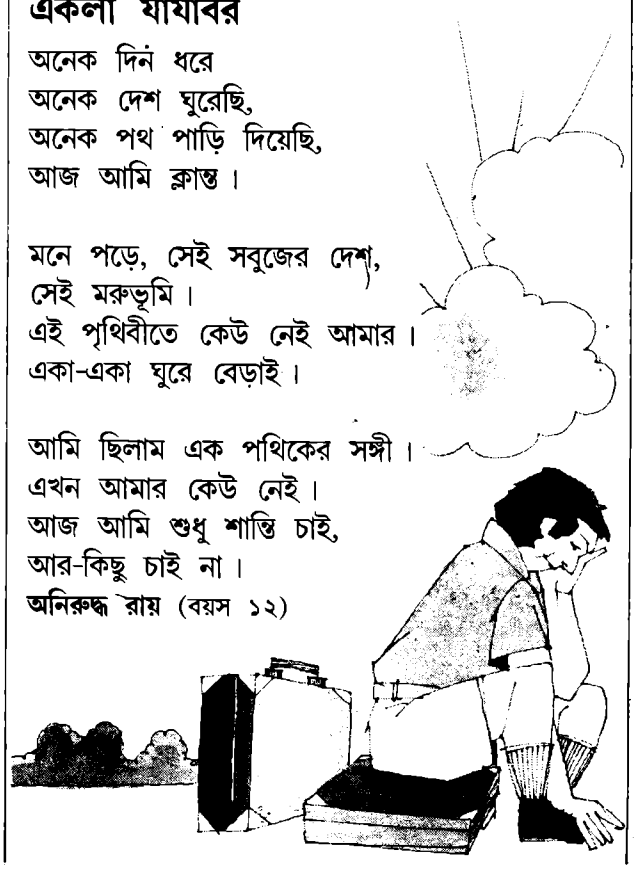

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। সায়ন যে বেওয়ারিশ ঘোড়ায় উঠেছিল, সেই ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে দীর্ঘকাল জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। বাইরের জগতের খবর তাঁর অজ্ঞাত। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন রহস্যের সন্ধান পায়, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে জ্ঞান হারায় সে। এক বৃদ্ধার সাহায্যে গুহা থেকে উদ্ধার পেয়ে সে দেখে, দুজন বন্দী লোকের একজনকে মেরে ফেলা হল। অন্য বন্দীটি গুপ্ত-মালের হদিস দিয়েছে। সায়ন তাদের পিছু নেয়। তারপর···

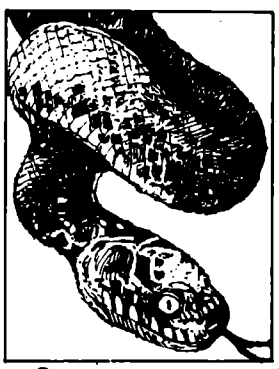

কাছাকাছি এসে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল সায়ন। অশ্বারোহী এবং লোকটি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, এমনকী, ঘোড়াটা পর্যন্ত নড়ছে না। সব শব্দ মিলিয়ে গেলে অশ্বারোহী ইঙ্গিত করল লোকটিকে এগিয়ে যেতে। ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি উদ্বেগের আঙুল তুলে দূরে দেখাল। অশ্বারোহী সেদিকে এক পলক তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ভঙ্গিটা এমন, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, তোমাকে যেতেই হবে।

সায়ন যতটা পারে সাবধানে ওদের অনুসরণ করছিল। ঠিক এই মুহূর্তে শরীরে কোনও ক্লান্তি টের পাচ্ছে না সে। বারংবার তার মনে হচ্ছে, এই পথে গেলেই সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। যে-পথে বাইরের দুটো মানুষ এখানে পৌঁছতে পারে, সেই পথ সে খুঁজে পেয়েছে। মাথার ওপরের আকাশটা দ্রুত রঙ পালটাচ্ছে। অবশ্য সেদিকে তাকাবার সময় ছিল না সায়নের। তার একমাত্র লক্ষ অশ্বারোহী এবং নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া। এবার অশ্বারোহী বেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ সে দুর্বোধ শব্দে তাড়া দিচ্ছিল, যাতে লোকটা দ্রুত হাঁটে। মাঝে-মাঝেই চারপাশে তাকিয়ে নিচ্ছিল। সেটা কী কারণে সায়ন জানে না, কিন্তু রাতটা খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এবার ওরা ঢালুর দিকে নামছে। সায়ন থমকে গেল। এতক্ষণ সে গাছের আড়ালে-আড়ালে ছিল। যদি অশ্বারোহী চট করে মুখ ফেরায়, তা হলে সে ধরা পড়ে যাবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের অনেকটা নামতে দিল সায়ন। তা ছাড়া তার মনে হল, একটু আগে যে জন্তুরা ছুটে গেছে পাগলের মতো, সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ফিরে আসবে এই পথে। আর যাই হোক তাদের সামনে পড়াটা মোটেই উচিত কাজ হবে না। অন্ধকারে নিশ্চিত পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু অন্ধকারও যে অনেক সময় খুব সহায়ক হয় তা এর আগে তার জানা ছিল না। এখন যখন চারধারে সূর্যদেবকে অভ্যর্থনা করার আয়োজন চলছে, তখন একই সঙ্গে ভাল লাগা এবং ভয় তাকে অধিকার করল। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজতে বের হবে, এবং তাকে ধরতে হয়তো বেশি অসুবিধে হবে না।

কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই, শুধু পাখিরা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই অবস্থায় সায়নের মনে হল কেউ তাকে লক্ষ করছে। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি সায়নকে সতর্ক করল। এবং তখনই সে জঙ্গলের আড়ালে দুটো চোখ দেখতে পেল। লোভী চকচকে এবং কুটিল চোখ। সায়ন আর অপেক্ষা করল না। দ্রুত লাফ দিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে লক্ষ করল, একটা হলদেটে আভা চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছিল প্রায়, বুকের খাঁচায় কোনও বাতাস নেই, কিছুটা জায়গা অতিক্রম করতেই জলের শব্দ শুনতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে সভয়ে দেখল কাছাকাছি সেই চোখ নেই। ওটা বাঘ কিংবা ওই ধরনের কিছু। এত বড় জঙ্গলে সবাই তো থাকতে পারে। কিন্তু এই প্রথম সে হিংস্র চোখ দেখতে পেল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সেই চোখ-জোড়া হাল ছেড়ে দেবে না।

পথ একটা আছে। ঘাস এবং বুনো আগাছার ওপর পায়ের চাপ পড়লে একটা দাগ ফুটে ওঠে। সেটা যদিও নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ায় অস্পষ্ট, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। দ্রুত পা চালাল সায়ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নদীর গায়ে এসে পড়ল। একে নদী না বলে তীব্র জলপ্রবাহ বলাই ভাল। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গোঙানির মতো শব্দ ছিটকাচ্ছে। বুনো আগাছায় ভর্তি বলে ওই জলের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই সময় কচি কলাপাতার মতো নরম রোদ টুক করে নেমে পড়ল গাছের মাথায়, নদীর বুকে। আলো ফুটছে, কিন্তু খুবই আদুরে ভঙ্গিতে। সায়ন আর একবার পেছনে তাকাল। অনেকটা দেখতে পাচ্ছে সে। জন্তুটা যদি কাছাকাছি থাকত, তা হলে দেখতে পেত সে। হয়তো রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে। সামনে পা ফেলতেই কান্না শুনতে পেল সায়ন। ককিয়ে, আচমকা আঘাত খাওয়ার পর যেমন মানুষ কেঁদে ওঠে, ঠিক সেই আওয়াজ। একটু থমকে থেকে সে শব্দটা অনুসরণ করে সামান্য এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। লোকটা মাটিতে উবু হয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে, আর অশ্বারোহী চাপা গলায় কতগুলো অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে রাগত ভঙ্গিতে। লোকটার পিঠের জামা ফালা-ফালা করে ছেঁড়া। সম্ভবত আঘাত লেগেছে ওখানেই। অশ্বারোহী আবার ঘোড়া চালাল। টান পড়ল দড়িতে। লোকটা একটু ঘষটে এগিয়ে যেতে যেতে কোনওরকমে উঠে সোজা হল। তারপর ঘোড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে লাগল। অশ্বারোহীর মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। সায়নের মনে হল দিনের আলো ফুটে যাওয়ার পর থেকেই লোকটা অস্থির হয়ে উঠেছে। এখন ওর সেই সতর্ক ভাবটা চলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। এতে সুবিধে হল সায়নের। সে চট করে ধরা পড়বে না। যদিও মাথার ওপরে সমানে পাখিরা চেঁচিয়ে

যাচ্ছে। এত ভোরে মানুষ দ্যাখেনি বোধহয় কখনও।

মিনিট দশেক চলার পর জলপ্রবাহ যেখানে একটু স্থির,এবং বোঝা যায় জল বেশ কম,সেখানে এসে লোকটা চিৎকার করে অশ্বারোহীকে দাঁড়াতে বলল। অশ্বারোহী ঘুরে তাকাতে সে নদীর অপর প্রান্ত নির্দেশ করল। ব্যাপারটা একদম মনঃপূত হচ্ছিল না অশ্বারোহীর। পার হবার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছিল না তার। প্রায় বাধ্য হয়ে সে লোকটাকে নদীতে নামতে বলল। এবং সেই সময় ঘোড়াটা চাপা ডাক ডাকল। কিছুতেই সে জলের কাছে যেতে চাইছিল না। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে পড়ল। কিন্তু তাতে দুটো পা পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা। অশ্বারোহী শেষমেশ নীচে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটাকে কিছু বলল। সায়ন একটা বিশাল শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া লোকটিকে লক্ষ করল। উচ্চতা বেশি নয়। পাহাড়ি মানুষের সবরকম বৈশিষ্ট্য ওর আছে। কিন্তু এই রকম কঠিন মুখ সে দ্যাখেনি কখনও। স্নেহ দয়া মায়া জাতীয় বোধের সঙ্গে যেন কোনওদিন পরিচিত নয় ওই মুখ। লোকটা কোমরে হাত দিয়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। যেন খুঁটিয়ে জল পরীক্ষা করল সে। এই জায়গায় পাড়ের কাঠে কোনও আগাছা নেই। পারাপারের জন্যে চমৎকার জায়গা। ফিরে এসে ঘোড়ার শরীর থেকে লোকটির কোমরে বাঁধা দড়ির অন্য প্রান্তটি খুলে নিয়ে সে ইঙ্গিত করল লোকটাকে জলে নামতে। তারপর ঘোড়াটাকে চিৎকার করে বলল কিছু। এসব শব্দের মানে সায়নের বোধগম্য নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গি অনেক সময় অর্থ বুঝিয়ে দেয়।

মালবাহক লোকটা জলে নামল। বড়জোর হাঁটু পর্যন্ত জল। কিন্তু সামান্য যে স্রোত বইছে তাই তাকে স্থির পদক্ষেপে হাঁটতে দিচ্ছিল না। তার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা বলে হাঁটতেও অসুবিধে হচ্ছিল। তা ছাড়া কোমরের দড়ির প্রান্ত লোকটি ধরে রেখেছিল টাইট করে। বোঝা যাচ্ছে অশ্বারোহী জলের চরিত্র জানে। কারণ তার পদক্ষেপ বেশ মাপা এবং স্রোতের টানে সে সরছে না। একসময় ওরা জলপ্রবাহ পার হয়ে গেল। সায়ন আর ওদের দেখতে পেল না। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে পা ঠুকছে। এই সময় জলে অন্যতর শব্দ হল। খুব বড় মাছ ঘাই মারলে জল যেরকম তোলপাড় হয়ে ওঠে, সেই রকম দেখতে পেল সায়ন। ওর চকিতে মনে পড়ে গেল প্রথম রাত্রের কথা। নদী পার হওয়ার সময় সে ঘোড়ার পিঠে বসে ওইরকম শব্দ শুনেছিল এবং ঘোড়াটা ভয়ে এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছিল যে, সে ছিটকে পড়েছিল ডাঙায়। সায়ন দেখল এই ঘোড়াটা শব্দ শোনামাত্র অনেকটা ওপরে সরে এল এবং তখনই সে ধরা পড়ে গেল। চোখাচোখি হতে ঘোড়াটা স্থির হয়ে গেল। সায়ন ওপরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। খুব সাহস করে সে চুকচুক শব্দে ডাকল ঘোড়াটাকে। ওর কান খাড়া হয়ে উঠল, কিন্তু নড়ল না। আড়াল ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই ঘোড়াটা সরে যাওয়ার ভান করল, কিন্তু সরল না। সায়নের কেবলই মনে হতে লাগল, এটা সেই ঘোড়াটাই,অতএব সে ওকে বশ মানাতে পারবে;এবং সেটা সম্ভব হল। দু'তিনবার লুকোচুরি খেলার পর ঘোড়াটা সায়নকে ওর গলায় হাত রাখতে দিল। খানিকটা আদর করার পরই সে ঘোড়াটাকে আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে এল গাছের আড়ালে। এবং তখনই জলপ্রবাহের অপর প্রান্তে প্রাণ-কাঁপানো আর্তনাদ উঠল। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে, তারপর চুপচাপ হয়ে গেল চরাচর। এমনকী পাখিরাও ডাক বন্ধ করল।

সায়ন আতঙ্কিত চোখে অপর পারের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই সময় অশ্বারোহীকে দেখা গেল, সে এবার একা এবং তার কাঁধের ওপর বিশাল একটা বস্তা। ওজন নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল লোকটার। সায়ন বুঝতে পারল মালবাহক লোকটার

অবস্থা তার সঙ্গীর মতনই হয়েছে। মাথা নিচু করে থাকায় অশ্বারোহীর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সেটা দেখতে পেলেও বোঝা যেত না সে একটু আগে অমন কাণ্ড করে এসেছে। নদীর প্রান্তে এসে লোকটা চিৎকার করে ডাকল। ডাকটা যে ঘোড়ার উদ্দেশে সেটা সায়ন বুঝতে পারল ঘোড়াটার চঞ্চলতা দেখে। "উসু"। দ্বিতীয়বার চিৎকারটা হতেই ঘোড়াটা ছুটে নেমে গেল নদীর কাছে। তারপর ধীরে-ধীরে পিছিয়ে এল। লোকটা বিরক্ত হয়ে বুঝল সে ঘোড়াটাকে এপারে নিয়ে এসে মাল বওয়াতে পারবে না। সায়ন আড়াল থেকে দেখল, লোকটা আবার জলে নামল। এখন নদী পার হয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে লোকটা ফিরে গেলে সে কী করবে ? তার কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কোনওমতে ওই ঘোড়াটাকে পাওয়া যেত তা হলে পালানো সুবিধেজনক হত। সে চাপা গলায় ডাকল, "উসু !" সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করে এদিকে মুখ ফেরাল ঘোড়াটা। ওর নাম যে উসু তা বুঝতে পেরে সে দ্বিতীয়বার ডাকল। লোকটি এখন নদীর এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করেছে। কিন্তু মালের ভারে সে সহজে হাঁটতে পারছে না। অন্তত যাওয়ার সময় যে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি ছিল সেটা নেই। বারংবার সে স্রোতের টানে পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছিল। এই সময় সে যদি আবার ঘোড়াটাকে ডাকে তা হলে সেটা লোকটার কানে যেতে পারে। সময় ফুরিয়ে আসছে, সুযোগ চলে যাচ্ছে সামনে থেকে। সায়ন কী করবে বুঝতে পারছিল না। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে যদি সে ঘোড়াটাকে না পায়, তা হলে তার অবস্থা মালবাহকের মতো হবে। সায়ন হতাশ হয়ে দেখল অশ্বারোহী নদী পার হয়ে এসেছে। পার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে সে সমানে গালাগালি করছে ঘোড়াটাকে, এবং সেই সময় কাণ্ডটা ঘটল। হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ল লোকটার ওপরে। সায়ন স্পষ্ট জলের ওপর একটা লেজের ঝাপটানি দেখতে পেল। চকিতে ঘোড়াটা ছুটে এল তার কাছে। আর আকাশ-কাঁপানো আর্তনাদ করে উঠল অশ্বারোহী। তার কাঁধ থেকে বস্তাটা ছিটকে পড়ল পারের কাছে। দু'হাতে নিচু হয়ে জলের মধ্যে থেকে কিছু ছাড়াতে গেল যেন। কিন্তু তারপরেই তলিয়ে গেল সে। ওপরের জল তোলপাড় হচ্ছিল। এবং আচমকা সব শান্ত হয়ে গেল। শুধু জলের রঙটা লালচে হয়ে উঠল কিছুটা জায়গা নিয়ে।

স্তম্ভিত হয়ে দৃশ্যটা দেখল সায়ন। অত বড় জলপ্রবাহে কোথাও অশ্বারোহীর চিহ্নমাত্র নেই। একটু আগে একটি মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে শাসন করছিল, এই মুহূর্তে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না। যেমন শান্ত ছিল নদীর ভঙ্গি এখন তেমনই আছে। নদীতে যে প্রাণীটি আছে সে তার আহার নিয়ে কোথায় চলে গেছে তা ওপর থেকে বোঝা যাবে না। পাখিরা ডাকছিল আবার। নিঃশব্দে প্রাকৃতিক নিয়মে যে-কাণ্ডটা ঘটে গেল তার সাক্ষী হয়ে রইল সায়ন এবং ঘোড়াটা। একটু পরেই তার বোধ ফিরে এল। ঘোড়াটা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সায়ন। সে জানে না কেন কাঁদছে। কিন্তু এমন মৃত্যু সে সহ্য করতে পারছিল না। ঘোড়াটাও ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠল। তারপর বন্ধুর মতো সায়নের গলায় মুখ ঘষতে লাগল। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ডাক্তারবাবু বলছেন

হেমন্তের ব্যায়াম

শীত বাড়ছে। অসুখও কমছে। আমাদের দেশে শীত যত বাড়ে, অসুখের প্রকোপও কমে আসে। শীত আসবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের শরীর ভাল হয়ে যায়। এ-সময়ে হজমও ভাল হয় এবং অজীর্ণ রোগও দেখা দেয় না। এখন যদি শরীর ভাল করে নিতে পারো, গ্রীষ্ম-বর্ষা তোমাকে আর ততটা কাবু করতে পারবে না।

রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। ছেলেরা একশো মিটার দৌড়বে, দশ থেকে পনেরোটা ডন-বৈঠক দেবে, ওঠবোস করবে। মেয়েরা একশো মিটার দৌড়বে, আর মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে দিয়ে পা জোড়া করে সোজা করে দেবে। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে দু' হাতের আঙুল দিয়ে দু' পায়ের আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবে। হাতের আঙুল দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁলে নিশ্বাস ছেড়ে দেবে। তারপর আবার শুয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে হাতের আঙুল দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁতে হবে। হাত কানের সামনে আসবে না আর হাঁটু ভাঁজ হবে না। দশ-পনেরোবার করলেই হবে, তবে নরম বিছানায় শুয়ে করলে হবে না। মাটিতে অথবা তক্তপোশের ওপর শুয়ে করতে হবে।

এই সময়ে ব্যায়াম করলে শরীরের কোষগুলো খুব সতেজ হয়ে ওঠে, তখন কাজ করতে, পড়াশুনো করতে খুব উৎসাহ আসে।

এখন বাজারে অনেক রকম তরিতরকারি পাওয়া যায়। সবকিছুই খেতে পারো, কোনও বাধা নেই। পালংশাক খেতে পারলে খুব ভাল হয়, কারণ পালংশাকে অনেক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আছে। ছোলার তরকারি বা ছোলা-সেদ্ধ খেতে পারো। ছোলাতে খুব প্রোটিন থাকে, আর প্রোটিন দেহের পুষ্টি জোগায়।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

মামণি ঠিক জানে,কখনো পুড়ে গেলে কি করতে হবে।

মামণি যে শিখেছিল দিদার কাছে

সত্যিই, মামণি আমার সোনা-সোনা। সেদিন কি হয়ে ছিল জানো ? আমার পুতুলের কাপড়টা মামণি ইস্তিরি করছিল। আমি তো দুষ্টু ছটফটে। গরম ইস্তিরিতে হাত দিয়ে ফেলেছি। আঙুল পুড়ে কি জ্বালা। ভাগ্যিস মামণি বার্নল লাগিয়ে দিল। মামণি বলল পুড়ে গেলে দিদাও এই রকম বার্নল-ই লাগাতো। পুতুলসোনা তোমার পুড়ে গেলে আমিও বার্নল লাগিয়ে দেব। ঠিক কিনা মামণি। ঠিক বলেছ বার্নল !

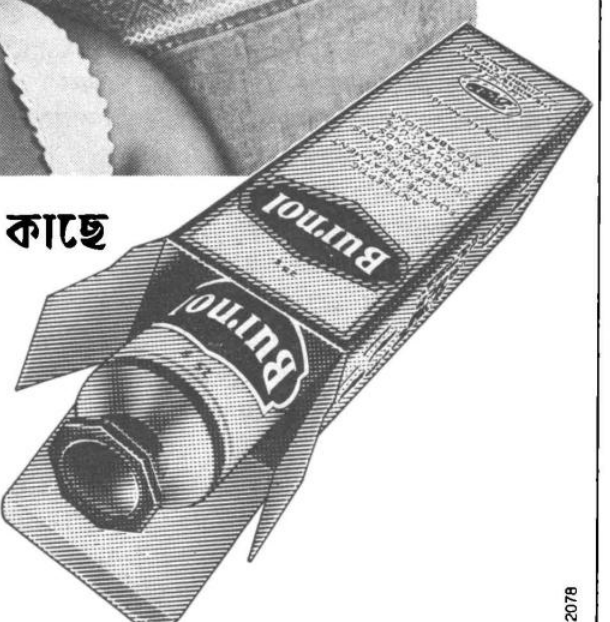

ঘরে-ঘরের ভরসাস্থল...

বার্নল

BL 2078

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : শার্লক হোমসের সঙ্গে বস্কোম্ব ভ্যালিতে যাচ্ছে ওয়াটসন। সেখানে জন টার্নারের ভাড়াটে চার্লস ম্যাকার্থি ঝিলের ধারে খুন হয়েছেন। ঘটনার আগে চার্লসের ছেলে জেমসকে নাকি বাবার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ যখন জেমসকে গ্রেফতার করে, সে আশ্চর্য হয়নি, বরং বলেছিল, এটাই তার পাওনা। সাক্ষ্যপ্রমাণ তার বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও যারা মনে করে যে, জেমস নির্দোষ, টার্নারের মেয়েও তাদের একজন। হোমসের ধারণাও তা-ই। ওয়াটসনকে সে কয়েকটা কাগজ পড়তে বলে। তারপর···

হোমস একটু আগে যে-কাগজগুলো বাণ্ডিল করে রেখেছিল, তার ভেতর থেকে হারফোর্ডশায়ারের একটা খবরের কাগজ বের করে নিল। তারপর কাগজের ভাঁজ খুলে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। খুনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওই ছেলেটি যা বলেছে সেটা ছাপিয়ে দিয়েছে। আমি সিটে হেলান দিয়ে বসে ওই জায়গাটা খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলুম। খবরের কাগজে লিখছে :

"এর পর নিহত ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হয়। সাক্ষি দিতে গিয়ে ম্যাকার্থি বলে, 'আমি তিনদিনের জন্যে ব্রিস্টলে গিয়েছিলুম। আমি ওই দিনই সকালে ফিরে আসি। আমি বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখতে পাইনি। আমাদের কাজের মেয়েটির কাছ থেকে জানতে পারি যে, জন কব বলে আমাদের যে সহিস আছে তাকে নিয়ে বাবা রস-এ কী কাজে গেছেন। একটু পরে আমাদের গাড়ির শব্দ শুনলুম। জানলা দিয়ে দেখলুম, গাড়ি থেকে নেমে বাবা গটগট করে বাগানের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তবে উনি কোন দিকে যাচ্ছেন তা আমি জানতে পারিনি। একটু পরে আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে বস্কোম্ব ঝিলের দিকে গেলুম। ওই ঝিলের ওপারে বুনো খরগোশ পাওয়া যায়। রাস্তায় উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। অবশ্য ও যা ভেবেছিল সেটা ঠিক নয়। আমি আমার বাবার পিছু-পিছু যাইনি। বাবা যে আমার একটু আগেই ওই দিক দিয়ে গেছেন তাও আমি জানতুম না। আমি যখন ঝিলের কাছে পৌঁছে গেছি তখন আমার কানে এল 'কুইই'। এই ডাকটা আমি আর বাবা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করি। এটা একটা আমাদের নিজেদের সিগন্যাল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলুম যে, বাবা ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা আমাকে সেখানে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন। একটু বিরক্ত ভাবে জানতে চাইলেন যে আমি সেখানে কী করছি। এর পর দু-একটা কথার পরেই কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা ভীষণ রাগী। আমি দেখলুম তিনি এত রেগে গেছেন, হয়তো একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবেন। তাই আমি সেখান থেকে চলে আসি। আমি দেড়শো গজ আন্দাজ গেছি, এমন সময় পেছন থেকে একটা আর্তনাদ কানে এল। আমি তখনই ছুটলুম। গিয়ে দেখলুম যে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাবা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় ভীষণ চোট লেগেছে। আমি বন্দুকটা ফেলে দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লুম। আমি তাঁকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলুম। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই। আমি কিছুক্ষণ তাঁর পাশে চুপচাপ বসে থেকে যে লোকটি বস্কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের তদারকি করে তার বাড়ির দিকে ছুটে যাই। আমি যখন চিৎকার শুনে ছুটে যাই, তখন কাউকে দেখতে পাইনি। বাবা একলাই পড়ে ছিলেন। আমার বাবার রাগী স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল না। তবে তাঁর কোনও শত্রুও ছিল না। এ-ব্যাপারে আমি আর কিছু জানি না।

করোনার : মারা যাবার আগে আপনার বাবা আপনাকে কোনও কথা বলেছিলেন কি ?

সাক্ষী : উনি বিড়বিড় করে জড়িয়ে জড়িয়ে 'র‍্যাট' 'র‍্যাট' বলছিলেন।

করোনার : উনি কী বলতে চাইছিলেন আপনি বুঝতে পারেননি ?

সাক্ষী : না। আমি ভেবেছিলুম যে উনি ভুল বকছেন।

করোনার : কী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কথা-কাটাকাটি শুরু হয়েছিল ?

সাক্ষী : সে-ব্যাপার আমি এখানে বলতে পারব না।

করোনার : না, সে-কথা আপনাকে বলতে হবে।

সাক্ষী : সে-কথা আমি কিছুতেই বলব না। তা ছাড়া বাবার মৃত্যুর ব্যাপারের সঙ্গে সে-কথার কোনও সম্পর্ক নেই।

করোনার : কোনও সম্পর্ক আছে কি নেই সেটা আদালতই ঠিক করবে। আর একটা কথা, আপনি যদি কথাটা এখন না বলেন তো ব্যাপারটা আদালতে বিচারের সময় আপনার বিপক্ষে যাবে।

সাক্ষী : তা হলেও আমি সে-কথা বলব না।

করোনার : আপনি বলেছেন যে আপনি আর আপনার বাবা নিজেদের মধ্যে 'কুইই' ডাকটা ইশারা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : তা হলে এটা কী করে সম্ভব যে আপনি ব্রিস্টল থেকে ফিরেছেন কি না জানার আগে, আপনাকে চোখে দেখবার আগেই উনি আপনাকে ওই ভাবে ডাকলেন ?

সাক্ষী : (রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে) আমি জানি না।

জুরি : আপনার বাবার চিৎকারে আপনি যখন ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন আর দেখলেন যে আপনার বাবা সাংঘাতিক ভাবে আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন, তখন আপনার চোখে এমন কিছুই কি পড়েনি যার থেকে কোনও সন্দেহ করা যায় ?

সাক্ষী : জোর করে বলবার মতো কিছু আমার নজরে পড়েনি।

করোনার : আপনি কী বলতে চাইছেন ?

সাক্ষী : আমি যখন ছুটে ওখানে গিয়ে হাজির হলুম তখন বাবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে যে আমি যখন ছুটে গেলুম আমার বাঁ দিকে মাটির ওপর ছাই-ছাই রঙের কী যেন একটা পড়ে ছিল। সেটা একটা কোট বা চাদর জাতীয় কিছু হতে পারে। কিন্তু আমি যখন বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালুম, তখন সেদিকে তাকাতে দেখলুম যে জিনিসটা নেই।

আপনি কি বলছেন যে আপনি যখন সাহায্য করবার জন্যে লোক ডাকতে গেলেন তার আগেই সেটা অদৃশ্য হয়েছে ?

হ্যাঁ। সেটা আর তখন ছিল না।

সেটা কী তাও আপনি সঠিক বলতে পারছেন না ?

না, তবে আমার ধারণা যে কিছু একটা ছিল।

সেটা আপনার বাবার কাছ থেকে কতদূরে পড়ে ছিল ?

বারো-চোদ্দ হাত দূরে হবে।

ঝোপ থেকে কত দূরে ?

ঐ রকম বারো-চোদ্দ হাত দূরেই হবে।

তা হলে আপনি যখন ওখানে ছিলেন তখনই আপনার বারো-চোদ্দ হাত দূর থেকে ওই জিনিসটি উধাও হয়ে গেল।

হ্যাঁ, তবে ওটা ছিল আমার পিছন দিকে।

সাক্ষীকে জেরা করা শেষ হল।"

খবরটা পড়া শেষ করে আমি বললুম, "করোনার ভদ্রলোক দেখছি ম্যাকার্থি ছোকরার সম্বন্ধে ভীষণ কড়া কথা বলেছেন। ম্যাকার্থির কথায় যে-সব গরমিল রয়েছে, সেগুলো বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আর সত্যি কথাই তো ও স্বীকার করেছে যে, কুইই ডাকটা ওর আর ওর বাবার মধ্যে চালু ছিল। ওর বাবা কুইই হাঁক পাড়লেন, অথচ ওর বাবা জানতেন না যে ও ফিরে এসেছে, এটা কী রকম কথা হল ! তারপর ও কেন বলছে না কী নিয়ে ওদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হল। তারপর ওর বাবার শেষ কথাগুলো সব মিলিয়ে ওইই অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।"

আমার কথা শুনে হোমস খুক-খুক করে হেসে উঠল। তারপর বেশ আরাম করে বসে বলল, "দ্যাখো ওয়াটসন, তুমি আর ওই করোনার ভদ্রলোক যে জিনিসগুলোর ওপর জোর দিচ্ছ সেগুলো কিন্তু জেমসকে নির্দোষ প্রমাণ করে। তোমরা যেভাবে ব্যাপারটা দেখছ, তাতে মনে হচ্ছে ও একই সঙ্গে ভীষণ চালাক আর ভীষণ বোকা। ছোকরা এতই বোকা যে, ও বাবার সঙ্গে ঝগড়া কী নিয়ে সে সম্বন্ধে এমন একটা মনগড়া কারণ দেখাতে পারল না যা শুনে জুরিদের মন নরম হয়। আবার উলটো দিকে তোমরা বলতে চাইছ যে, ও এতই ধড়িবাজ যে ওই 'র‍্যাট' কথা-টথা বলে সবাইকে ধোঁকা দিতে চাইছে। না হে, আমি কিন্তু ওই ছোকরা সত্যি কথা বলছে ধরে নিয়েই তদন্ত শুরু করব। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। যাই হোক, আর কোনও কথা নয়। এবার আমি খানিকক্ষণ পেত্রার্কের বইটা পড়ব। আর মিনিট কুড়ি পর আমরা সুইনডন পৌঁছব। সেখানে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নেব।"

বিকেল চারটে নাগাদ আমরা রস স্টেশনে এসে নামলুম। প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যে যে রোগা ছটফটে ধূর্ত চেহারার লোকটি অপেক্ষা করছিল তাকে চিনতে আমার অসুবিধে হল না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনস্‌পেকটর লেস্ট্রেড। লণ্ডনের বাইরে এসেছে বলে লেস্ট্রেডের জামাকাপড়ও একটু অন্যরকম। লেস্ট্রেড আমাদের নিয়ে গেল হারফোর্ড আরমস নামে একটা হোটেলে। সেইখানে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা বসে চা খাচ্ছিলুম। লেস্ট্রেড হোমসকে বললে, "আমি একটা গাড়ি ঠিক করেছি। আপনার যেরকম উৎসাহ তাতে খুনের জায়গাটা না দেখা পর্যন্ত আপনি যে ক্ষান্ত হবেন না, তা তো জানি।"

হোমস বলল, "আপনার দূরদৃষ্টি আর বিবেচনার প্রশংসা করতেই হয়। তবে এখন প্রশ্ন হল ব্যারোমিটারের চাপ কী রকম।"

লেস্ট্রেড হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

"দেখি তো ব্যারোমিটারে কী বলছে। ঊনত্রিশ। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, বাতাসও দিচ্ছে না। নাহ্, আজ আর গাড়িটার দরকার হচ্ছে না। তার চেয়ে বরং আমার কাছে বাক্সভর্তি যে সিগারেটগুলো রয়েছে, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। সাধারণত মফস্বলের হোটেলের আসবাবপত্র যেরকম হয়, তার চেয়ে এই হোটেলের আসবাবপত্র ঢের বেশি আরামদায়ক।"

লেস্ট্রেড একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসল। "খবরের কাগজে যেসব খবর বেরিয়েছে, তার থেকেই মিঃ হোমস, আপনি বোধহয় তদন্তের মীমাংসা করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা একদম জলের মতো সোজা। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছি ততই সবটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তবে ওইরকম জেদি মহিলার কথা না মেনেও পারিনি। উনি আপনার কথা অনেক শুনেছেন। আপনার মতামত না শুনে ছাড়বেন না। আমি অবশ্য ওঁকে বারবারই বলেছি যে এ-ব্যাপারে আমি যতদূর করবার করেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আপনিও করতে পারবেন না। ....আরে ওই তো ওঁর গাড়ি এসে থামল বলে মনে হচ্ছে।"

লেস্ট্রেডের কথা শেষ হতে-না-হতে ঘরের ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকলেন এক অল্পবয়সী মহিলা। মহিলাকে দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর শার্লক হোম্‌সের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"ও মিঃ শার্লক হোমস, আপনি আসায় আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না। এই কথাটা বলতেই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আমি জানি যে, জেমস এ-কাজ করেনি। এটা আমি জানি। আর আমি চাই যে, এ-কথাটা ধরে নিয়েই আপনি কাজে হাত দিন। জেমস যে নির্দোষ সে-কথা কিন্তু আপনি ভুলেও অবিশ্বাস করবেন না। আমি জেমসকে ছেলেবেলা থেকে জানি। ওর দোষ-গুণ সবই জানি। ওর স্বভাবটা এত নরম যে, ওর পক্ষে কোনও একটা পোকামাকড়কে মারাই শক্ত।"

হোমস বলল, "আমার মনে হচ্ছে যে ওঁকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব। বিশ্বাস করুন মিস টার্নার, আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।"

"আপনি তো সব তথ্য-প্রমাণের কথা কাগজে পড়েছেন। তার থেকে তো আপনি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন। এই তথ্য-প্রমাণের মধ্যে আপনি কি কোনও গলদ দেখতে পাননি ? আপনার কি মনে হচ্ছে না যে, জেমসের কোনও দোষ নেই !"

"আমার ধারণা জেমস নির্দোষ।"

"এবার কী হবে !" মিস টার্নার লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনছেন তো মিঃ লেস্ট্রেড, মিঃ হোমস আমাকে আশা দিচ্ছেন।"

লেস্ট্রেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমার বন্ধু বোধহয় এ-ব্যাপারে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে মনস্থির করে ফেলেছেন।"

"কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলছেন। আমি জানি উনি ভুল করেননি। জেমস এ-কাজ করতেই পারে না। আর ওর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল তা যে ও করোনারকে কেন বলেনি তাও আমি জানি।"

"আপনি কীভাবে জানলেন?" হোমস জানতে চাইল।

"বলছি। সব কথাই খুলে বলছি। জেমস আর আমি ছেলেবেলায় একসঙ্গে ভাই-বোনের মতো মানুষ হয়েছি। কিন্তু মিঃ ম্যাকার্থি এ-বিষয়ে মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর অন্যরকম ইচ্ছে ছিল।"

"এ ব্যাপারে আপনার বাবার মত কী?" হোমস প্রশ্ন করল।

"মিঃ ম্যাকার্থির সঙ্গে এ-ব্যাপারে বাবার মতের মিল ছিল না।"

"একটা খুব জরুরি খবর দিলেন। কাল সকালে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?"

"ডাক্তারবাবু রাজি হবেন কি না বলতে পারছি না।"

"ডাক্তারবাবু?"

"সে কী, আপনি শোনেননি? গত কয়েক বছর ধরে বাবার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আর এই ঘটনার পর একদম ভেঙে পড়েছেন। সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। ডঃ উইলোজ বলছেন যে, বাবার নার্ভগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মিঃ ম্যাকার্থিই বোধহয় একমাত্র লোক যিনি বাবাকে বেশ সুস্থ-সবল দেখেছেন। ওঁদের পরিচয় হয় ভিক্টোরিয়ায়।"

"ওহো, ভিক্টোরিয়ায়! তাই নাকি! তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। খনিতে।"

"ঠিক, ঠিক। ওখানকার সোনার খনিতে। সেখানেই বোধহয় আপনার বাবা ব্যবসায় উন্নতি করেন।"

"ঠিক তাই।"

"মিস টার্নার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক দরকারি খবর দিলেন।"

"মিঃ হোমস, আপনি যদি কিছু খবর পান তো আমাকে জানাবেন কিন্তু। আপনি নিশ্চয়ই জেলখানায় জেমসের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আপনি যদি যান তো অবশ্যই মনে করে জেমসকে বলবেন, সে যে এই কাজ করেনি তা আমি জানি।"

"আমি নিশ্চয়ই এ-কথা তাকে বলব মিস টার্নার।"

"এবার আমি বাড়ি যাব। বাবার শরীর খুবই খারাপ। আমি বাড়ির বাইরে থাকলে উনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন। চলি। ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

মিস টার্নার যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলেন, তেমনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। লেস্ট্রেড বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, "মিঃ হোমস, আপনার কাণ্ড দেখে সত্যিই লজ্জা বোধ করছি। কেন আপনি ওঁকে মিথ্যে আশা দিলেন। আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, এ-মামলায় আর কিছুই করবার নেই। আমি অবশ্য কোমলহৃদয় নই, তবু আপনি যা করলেন সেটা আমার কাছে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে।"

হোমস বলল, "জেমস ম্যাকার্থিকে কীভাবে খালাস করা যাবে তা আমি বুঝে গেছি, ভাল কথা, আপনার কাছে জেমসের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিপত্র আছে কি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি আর আপনিই যেতে পারি।"

"তা হলে আজ রাত্রে বাইরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা বদলাতে হচ্ছে। এখন হারফোর্ড যাবার কোনও ট্রেন আছে কি? সে গাড়িতে গেলে জেমসের সঙ্গে দেখা হবে?"

"খুব, খুব।"

"তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি। ওয়াটসন, তোমার হয়তো একলা-একলা একটু খারাপ লাগবে।।তবে আমি ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যেই ফিরব।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধা

ছোট্‌কা যে এভাবে বোকা বানাবে ভাবিনি। বলতে গেলে, ছোট্‌কা যে সরাসরি এর জন্য দায়ী, বলা যাবে না। আসলে আমি নিজেই পা দিয়েছি ফাঁদে। ফাঁদটা অবশ্য অনিবার্য, প্রলোভন এড়ানো অসম্ভব ব্যাপার।

অন্তত সবটা শোনার পর তাই মনে হয়েছে আমার।

ব্যাপারটা বরং খুলে বলি।

ছোট্‌কা আমায় বলল, "সামনে পরীক্ষা, তাই খুব সহজ একটা ধাঁধা দেব। পারবি ?"

"সহজ হলে পারব না কেন ?" আমি জবাবে বলেছি।

"ভেরি গুড।" হালকা ভাবে বলল ছোট্‌কা। তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে ফের বলল, "ধাঁধা মানে একটা সহজ অঙ্কও বলা যায়। তবে হ্যাঁ, ধাঁধার মতোই এখানেও রয়েছে বুদ্ধির পরীক্ষা। পুরো ধাঁধাটা আমি বলে যাব। আর সেটা শুনতে-শুনতেই তোমায় ভাবতে হবে, কী ধরনের প্রশ্ন সব-শেষে গিয়ে করতে পারি আমি। সেই প্রশ্ন মাথায় রেখেই ধাঁধাটা শুনতে হবে। একটা শর্ত হল, দু-বার পুরোটা বলব না। সবটা শোনা যেই শেষ হবে, অমনি প্রশ্ন করব, আর তৎক্ষণাৎ উত্তর বলতে হবে।"

আমি ঘাড় নাড়লাম। ছোট্‌কা বলল, "তা হলে শুরু করছি।" (তোমরাও ছোট্‌কার শর্ত অনুযায়ী ধাঁধাটা পড়ে যাও।)

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়ল। পুরো খালি বাস, কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। প্রথম স্টপে বাসটায় ১০ জন যাত্রী উঠল। পরের স্টপে নেমে গেল ৫ জন, নতুন যাত্রী উঠল ১২ জন। এর পরবর্তী স্টপে ৮ জন উঠল, ২ জন নেমে গেল। এর পরে ফের বাস থামল যে-স্টপে, সেখানে ১৪ জন যাত্রী উঠল, ৯ জন যাত্রী নামল। আর একটিমাত্র স্টপে এর পর বাস থামল। সেই স্টপে উঠল ২ জন যাত্রী, নামল ১ জন।

কী ? প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি ? আর কিন্তু পিছন ফিরে দেখা চলবে না। এবার বলো, টার্মিনাস থেকে ছাড়ার পর ক'টা স্টপে বাসটা থেমেছিল ?

চটপট বলো। চটপট।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মানুষ ভুল করে কখন ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ৯-কে ছ'বার ব্যবহার করে ১০০ বানাতে পারো ? কীভাবে ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) পাঁচটি পেন, একটি কালির শিশি ও চুরানব্বইটি বলপেন। (২) H_2O (H to O) মানে জল। (৩) চোরাকারবার।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

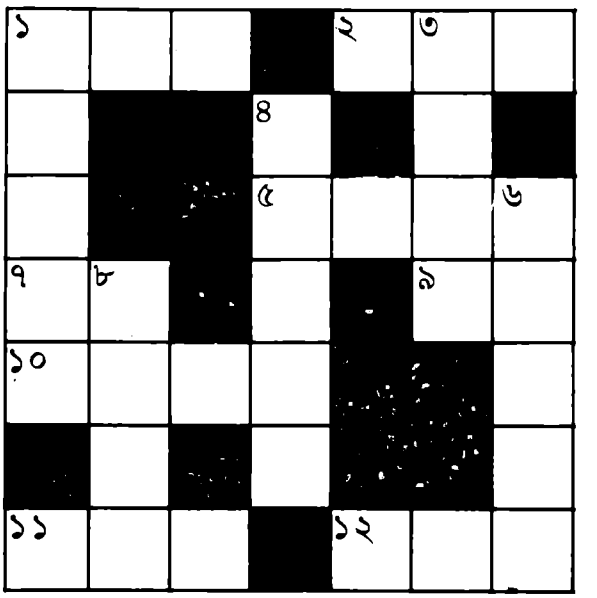

সংকেত : পাশাপাশি: (১) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২) নৌকো, আবার নৌকো চালাতেও লাগে। (৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে-শহর ধ্বংস হয়েছিল। (৭) কাল্পনিক পাখি। (৯) অন্তঃকরণ। (১০) খাজা-জাতীয় মেঠাই। (১১) গুলি ছোঁড়ে। (১২) সপ্তস্বরের একটি।

উপর-নীচ : (১) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক। (৩) কোনও কাজে হয়রান হলে কী খাও ? (৪) সাপুড়ে। (৬) কোন্ মন্দির থেকে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয় ? (৮) তরবারি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

শ	ক	ট	■	সা	হা	রা
■	ল	■	স	■	ল	■
শে	র	■	ং	■	খা	জা
■	ব	ং	শ	ল	তা	■
আ	■	■	প্ত	■	■	হাঁ
য়	■	কাঁ	ক	ন	■	সু
না	ল	ক	■	দ	ম্ভো	লি

রঞ্জন

মজার খেলা

একুশটা ব্যবহৃত দেশলাইকাঠি বা টুথপিক লাগবে এবারের মজার খেলার জন্য। জোগাড় করে ফেলো প্রথমে।

জোগাড় হয়েছে ? বেশ। এবার নীচের ছবির মতো ভুল অঙ্কের চেহারায় সাজিয়ে ফেলো কাঠিগুলোকে—

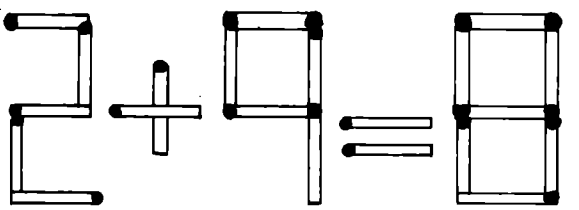

রোমান হরফে লেখা ২+৯=৮। হ্যাঁ, এই ভুল অঙ্কটাই বন্ধুদের সামনে রাখো।

সমস্যাটা হল, একটামাত্র কাঠিকে তুলে ফের এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কিনা টেবিলে একটা ঠিক অঙ্ক পড়ে থাকে।

এই সমস্যার উত্তরই করতে দাও বন্ধুদের। দেখবে কী-রকম হিমশিম খাচ্ছে তারা সমস্যাটার সমাধান করতে। চট করে উত্তর মাথায় খেলবে না।

কেন খেলবে না জানো ?

আসলে উত্তরটা যে খুবই সহজ। সহজ বলেই সহজে চোখে পড়তে চায় না সমাধানের পথ।

সমাধানটা কী দেখবে ? বেশ, দেখিয়েই দিই তা হলে—

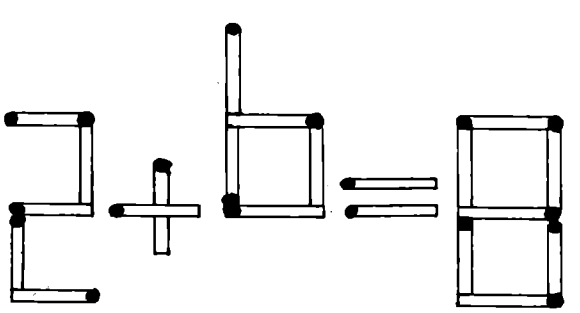

মজারু

হাসিখুশি

প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাসে শঙ্কিত বাবা-মা তাঁদের একমাত্র ছেলেকে দেড়শো মাইল দূরে এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। দু' দিন পরে বন্ধুর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল—'ঝড়টাকে এদিকে পাঠিয়ে দিয়ে, ছেলেকে ফেরত নিয়ে যাও।'

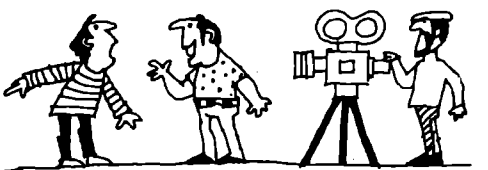

"আপনাকে ছবির এই দৃশ্যে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়তে হবে।"

"যদি আমি মারা যাই ?"

"চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওটাই ছবির শেষ দৃশ্য।"

বাবা পিকলুকে বললেন, "তুমি একটি নির্বোধ। কাকে নির্বোধ বলে জানো ?"

"জানি বাবা। নির্বোধের ছেলেকে বলে।" ঝটপট উত্তর দিল পিকলু।

"তিন-তিনটে ছাতা নিয়েছেন কেন বিমলবাবু ?"

"একটা নিয়েছি যদি ভুল করে ট্রেনে ফেলে আসি, একটা অফিসে, আর অন্যটা নিয়েছি হঠাৎই যদি বৃষ্টি শুরু হয়।"

"ওহো, আপনি যে একেবারে ভিজে চুপ্পুস হয়ে গেছেন দেখছি।"

"আমি গান গাইলেই সমস্ত শ্রোতা হাততালি দেয়।"

"কেন দেয় বলো তো ? যাতে তোমার গান তাদের কানে না পৌঁছয়।"

"ওয়েটার, ওয়েটার তাড়াতাড়ি এসো। আমার সুপের মধ্যে একটা মাথার চুল।"

"কালো না বাদামি স্যার ? আমাদের একজন রাঁধুনিকে দু' দিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"পিকলু, তুমি বাবুনকে বাঁদর বলেছ কেন ? যাও, এ-কথা বলার জন্য তুমি যে দুঃখ পেয়েছ, জানিয়ে এসো।"

"বাবুন, তুমি বাঁদর, সেজন্য আমি দুঃখিত।"

ছবি : দেবাশিস দেব

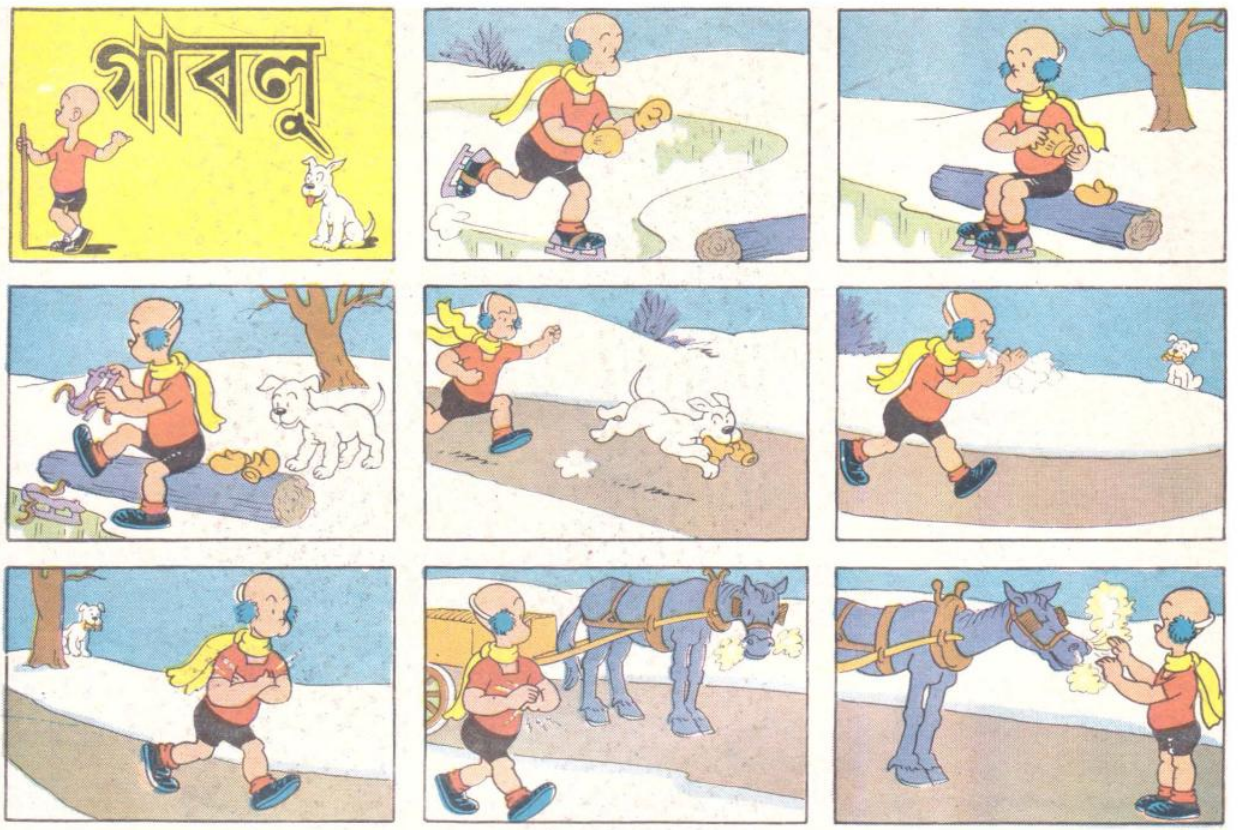
গাবলু

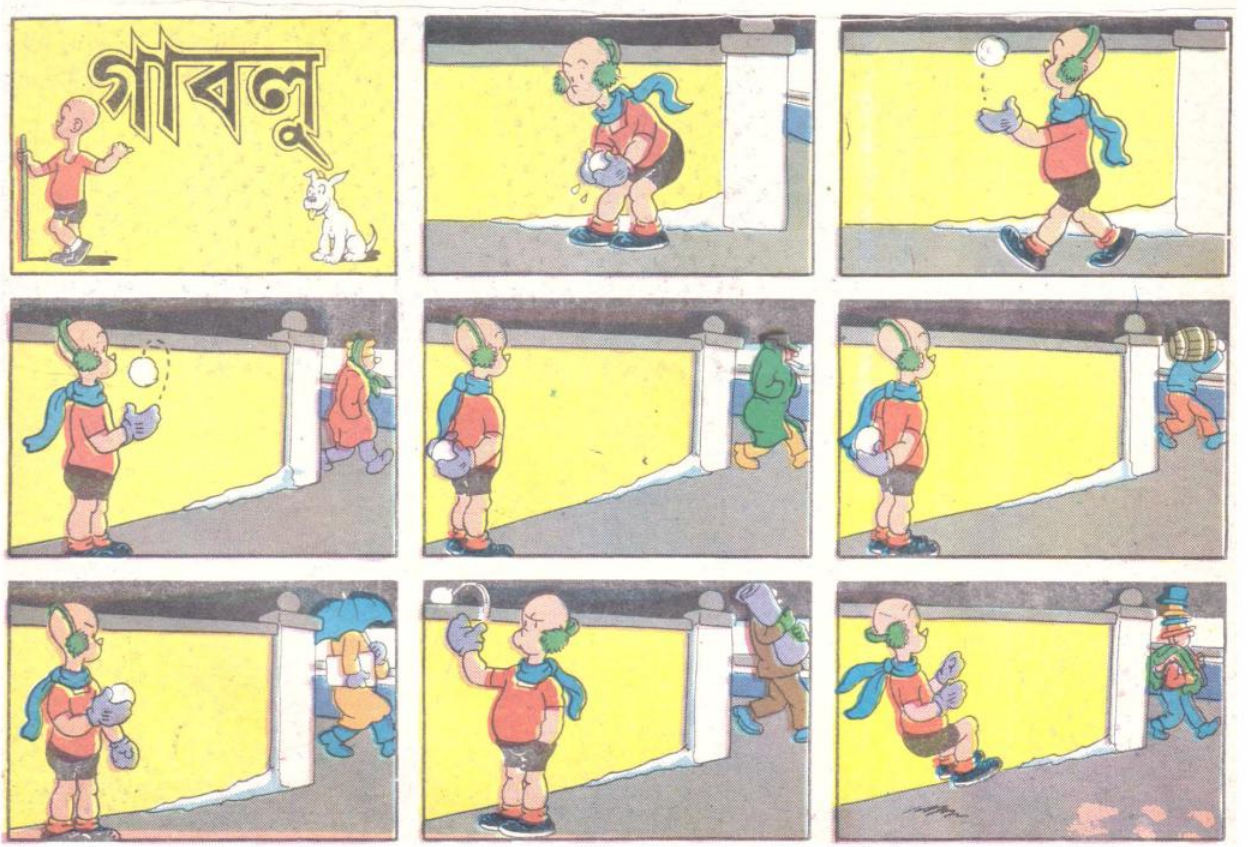
গাবলু

ইভান লেণ্ডল

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

এমন সাদা, যেন নতুন !

ধোলাইয়ের পর ধোলাই...প্রতি ধোলাই !
পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন !

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা, তেমনিই ধবধবে সাদা.....যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো..... অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পৌঁছে সাফ করে, আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয় – তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত.....সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা.....নতুনের মত সদাসর্বদা !

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ !

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 323 2720 BG

লেণ্ডলের লাভ 'সোনার র‍্যাকেট'

সম্রাট রায়

লড়াইটা যখন ম্যাকেনরো আর লেণ্ডলের মধ্যে তখন কি আর অন্য ঘটনায় চোখ রাখা যায় ? তার ওপর যোগ হয়েছে এমন আরও কতগুলো ব্যাপার, যা একরকম জোর করেই কেড়ে নিয়েছে আমাদের যাবতীয় আকর্ষণ। টুর্নামেণ্টের নাম, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানস্ চ্যাম্পিয়ানশিপ। ইনডোর টেনিসে সবচেয়ে বেশি টাকার পুরস্কার দেওয়া হয় এই প্রতিযোগিতাতে (প্রথম পুরস্কার প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা)। কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা ব্যাপার আছে। এই প্রতিযোগিতার নিয়মে আছে, যে খেলোয়াড় পাঁচ বছরের মধ্যে তিনবার এই ট্রফি জিতবেন তাঁকে দেওয়া হবে ছ'কিলো ওজনের সোনার একটা র‍্যাকেট, যার ওপর বসানো আছে ১৫০০ হীরকখণ্ড। র‍্যাকেটটির দাম প্রায় ৯১ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। লেণ্ডল-ম্যাকেনরো ফাইনাল কেন জমজমাট, সেটাও একটু জেনে রাখো।

এই টুর্নামেণ্ট শুরু হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম বছর লেণ্ডল জিতেছিলেন ম্যাকেনরোর বিরুদ্ধে। '৮৩ সালে জিতেছিলেন ম্যাকেনরো। পরের বছর আবার চ্যাম্পিয়ান হন লেণ্ডল। সুতরাং এই বছর লেণ্ডল জিততে পারলে ৫ বছরের মধ্যে তিনবার জয়ের এবং বহুমূল্য সোনার র‍্যাকেটের অধিকারী হতে পারবেন তিনি। ওদিকে ম্যাকেনরোও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্র টেনিসের ফাইনালে তাঁকে হার মানতে হয়েছিল লেণ্ডলের কাছে। বদলা নেবার ব্যাপারটা তিনিও চট করে ভুলে যাবেন না। তার ওপর সেমিফাইনালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ১৭ বছরের 'বিস্ময়-বালক' বরিস বেকারকে হারিয়ে টগবগ করছিলেন ম্যাকেনরো। বলা বাহুল্য, এতগুলো ব্যাপার জড়ো হয়েছিল বলেই এই টুর্নামেণ্টের ফাইনাল নজর কেড়েছিল সকলের।

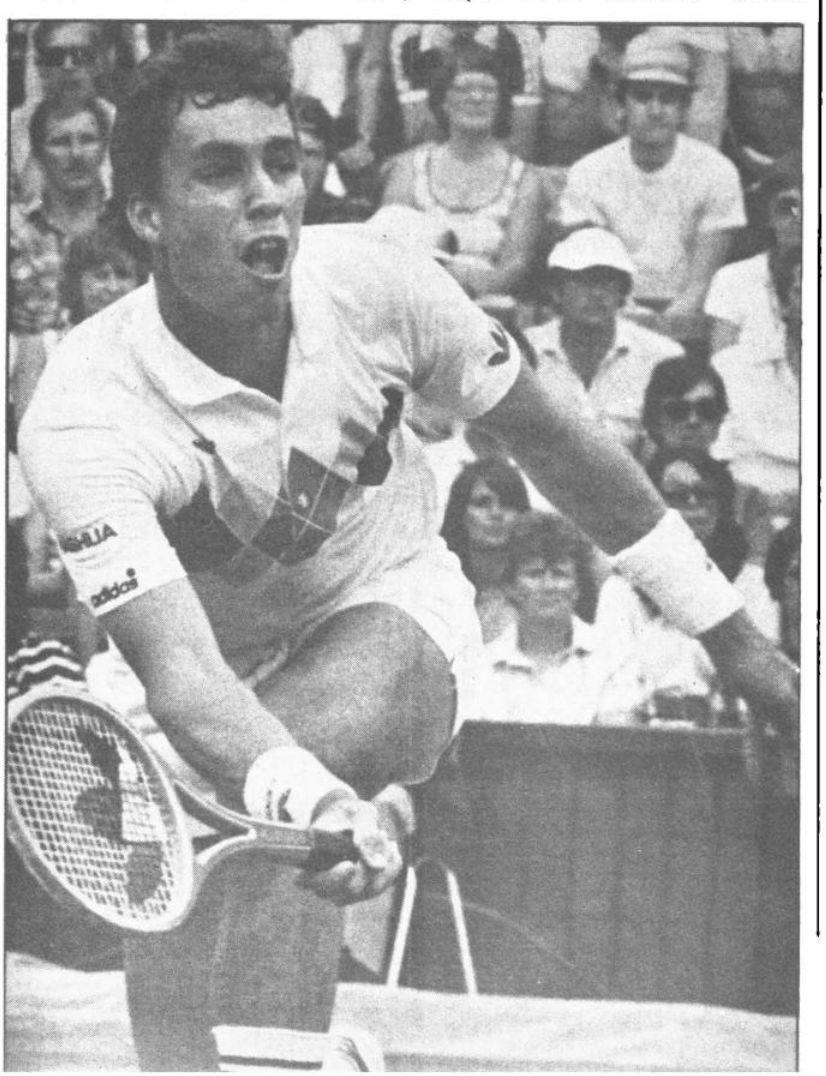

ম্যাকেনরো খেলা শুরু করেছিলেন ভয়ঙ্করভাবে। দর্শনীয় পাসিং শট এবং চমৎকার ক্রস-কোর্ট ভলিতে লেণ্ডলকে নাস্তানাবুদ করে মাত্র ৩১ মিনিটেই প্রথম সেট দখল করেন ৬-১ গেমে। ম্যাকেনরোর প্রারম্ভিক দাপটে মনে হয়েছিল লেণ্ডল বুঝি উড়ে যাবেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে দুটি দুর্দান্ত 'এস' সার্ভিস করেই লেণ্ডল নিজেকে ফিরে পান। এবং টাইব্রেকারে শেষপর্যন্ত ৭-৬ গেমে সেট দখল করেন তিনিই। দ্বিতীয় সেট হাতছাড়া হতেই ম্যাকেনরোর একাগ্রতায় চিড় ধরে। পদে পদে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকেন তিনি। ম্যাকেনরোর প্রতিটি ভুল একটু একটু করে আস্থা বাড়িয়ে দিতে থাকে লেণ্ডলের। শেষ পর্যন্ত পরের দুটি সেট ৬-২, ৬-২ গেমে জিতে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট লড়াইয়ে ইতি টানেন লেণ্ডল এবং লাভ করেন হীরকখচিত সোনার র‍্যাকেট।

লেণ্ডলের জয়ে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। ম্যাকেনরোর দিন শেষ হতে চলেছে। আসলে এক নম্বর জায়গাটা বড়ই পিছল। বিয়র্ন বর্গের পর টেনিস-বিশ্বের এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন জন ম্যাকেনরো। এবার তাঁর গড়িয়ে পড়ার পালা। ভাবা যায় এ-যাবৎ যে তিনটি গ্র্যাণ্ডস্লাম ইভেণ্ট হয়ে গেছে (ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেন) তার কোনওটিতেই চ্যাম্পিয়ান হতে পারেননি ম্যাকেনরো ! তাঁকে সরিয়ে বিশ্বের এক নম্বর জায়গায় এখন উঠে এসেছেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা, ১৭৫ পাউণ্ড ওজনের 'আয়রনম্যান অব চেকোস্লোভাকিয়া' ইভান লেণ্ডল।

নতুন চরিত্র, নতুনতর কাণ্ডকারখানা

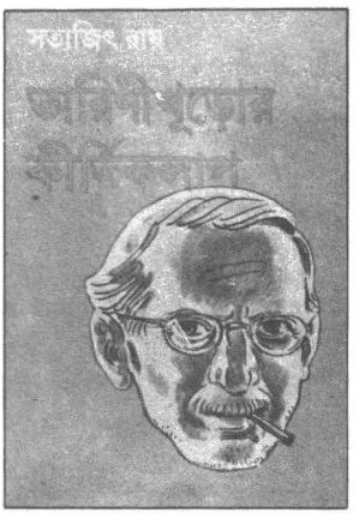

হইহই করে হাতে-হাতে ঘুরছে

সত্যজিৎ রায়ের

নতুন রসের নতুন-নতুন গল্প

তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ

দাম ১০·০০

প্রোফেসর শঙ্কু কিংবা গোয়েন্দা ফেলুদার মতই সজীব, সরস, কৌতুহলকর এক অভিনব চরিত্র এনেছেন সত্যজিৎ রায়, যে-চরিত্রের বর্ণময় নানান অভিজ্ঞতার গল্পে নতুনতর রসের আকর্ষণ।
ফেলুদার রহস্য-ভেদে বুদ্ধির চমক, শঙ্কু-কাহিনীতে কল্প-বিজ্ঞানের ইশারা, তারিণীখুড়ো নামের নতুন চরিত্রের কীর্তিকলাপের অধিকাংশ গল্পে- অ- লৌকিকত্বের বিস্ময়-শিহরন।
ভারতবর্ষের তেত্রিশ শহরের ছাপ্পান্নরকম কাজ করেছেন তারিণীখুড়ো, ফলে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঠাসা এমনই অফুরন্ত তাঁর গল্পের স্টক যে, দু-ভল্যুম আরব্য-উপন্যাস লেখা চলে। আর্টের খাতিরে একটু-যা রঙ চড়ানো, এ-ছাড়া সবই নাকি সত্যি। কলকাতার বেনেটোলা লেনের আড্ডায় বসে দুধ-চিনি ছাড়া 'র' চায়ে চুমুক দিয়ে সেইসব গল্পই শোনান এখন তারিণীখুড়ো। সেই স্টক থেকে আটটি নিয়ে এই বই। ডুমনিগড়ের মানুষখেকো, পুনের প্রেতাত্মা, হায়দ্রাবাদের বেতাল, মার্তণ্ডপুরের ক্রিকেটম্যাচ, লখনৌয়ের ডুয়েল, ধুমলগড়ের পোড়োবাড়ি, আজমিরের শেঠ বা কলকাতায় টলিউড নিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যার অতীত আটটি দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা।
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায়ের

আপাদমস্তক হাসির বই

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

দাম ১০·০০

প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প। গল্প তো নয়, টসটসে আঙুরের থোকা। সংহত, নিটোল, রসে ভরপুর। জিভে ছোঁয়ালেই হাসি।
পরমান্ন যেমন মিষ্টি ছাড়া হয় না, রসগোল্লা যেমন বিনারসে তৈরি হওয়া অসম্ভব, মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্পের সঙ্গে তেমনি মিশে থাকে অনিবার্য কৌতুক। অনেকে বলেন এ-সব গল্পের জন্ম তুরস্কে। সেখানে প্রতিবার মোল্লার জন্মদিন পালিত হয়। কিন্তু জন্ম যেখানেই হোক, মোল্লা নাসীরুদ্দীন আজ দেশ কালের সীমানা ছাড়ানো এক বিরলবিচিত্র বিশ্বব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর যে-প্রান্তেই রসিক মানুষ, সেখানেই তাঁর গল্প। মোল্লা নাসীরুদ্দীনের সেই কালজয়ী গল্পেরই নির্বাচিত এক সংগ্রহ এই বইতে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। পাতায় পাতায় নতুন আঁকা মজার ছবি, চোখ-ভোলানো প্রচ্ছদপট। সত্যজিৎ রায়ের তুলিতে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

মোহনবাগানের রোভার্স জয়

অশোক রায়

এক, দুই, তিন। পর পর তিনটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগান। প্রথমে সিকিম গোল্ড কাপ, তারপরে দিল্লিতে ডুরাণ্ড এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বোম্বাই থেকে তুলে নিল রোভার্স কাপ তবে যত সহজে তুলে নিল কথাটা বললাম, ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজে ঘটেনি। সেমিফাইনালে কলকাতারই আর-এক প্রধান দল মহমেডানের সঙ্গে টাইব্রেকারে মরণপণ সংগ্রাম করে তবেই জয় পায় মোহনবাগান।

ভাবতে পারো, সেমিফাইনালে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে ছিল ৮৭ মিনিট? তার মানে খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে পর্যন্ত মোহনবাগানের কট্টর সমর্থকও ভাবেননি এই ম্যাচ জেতা যাবে। মহমেডানের পক্ষে চিমা সেদিন নাস্তানাবুদ করেন মোহনবাগান ডিফেণ্ডারদের। দ্বিতীয় মিনিটেই চিমা মোহনবাগানের চারজন ফুটবলারকে কাটিয়ে যে অসাধারণ গোলটি করেন, তা বহুদিন মনে থাকবে বোম্বাইয়ের মানুষদের। তাঁর দুর্দান্ত গোল মোহনবাগানিদের আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেয় অনেকখানি। গোটা দল চিমা-আতঙ্কে ভুগতে থাকে। মহমেডান ফাইনালে যাচ্ছেই, এই ধারণাটা যখন সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই বাবু মানির পাস থেকে চমৎকার গোল করে মোহনবাগানকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনলেন সুবীর সরকার। সুতরাং টাইব্রেকার। টাইব্রেকারে ম্যাচের রং বদলে দিলেন মোহনবাগানের গোলকিপার তনুময়। মহমেডানের নেওয়া তিনটি পেনাল্টি শটের মধ্যে দুটি আটকে গেল তনুময়ের চুম্বক হাতে। আর মোহনবাগানের পক্ষে গোল করলেন কৃষ্ণেন্দু, সমর এবং বাবু মানি। অর্থাৎ মোহনবাগান জিতল মোট ৪-১ গোলে।

ওদিকে সালগাওকরকে একা ফাইনালে নিয়ে গেলেন দলের গোলরক্ষক ব্রহ্মানন্দ। সালগাওকর এবং ডেম্পো, গোয়ার এই দুটি দলের মধ্যে দারুণ রেষারেষি। আগাগোড়া ম্যাচটা ডেম্পো খেলল। কিন্তু তাদের যাবতীয় গোলমুখী আক্রমণ একের পর এক রুখে দিলেন ব্রহ্মানন্দ। এমন কী, একটা পেনাল্টিও আটকালেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ডায়াসের গোলে ডেম্পোকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি হল সালগাওকর।

ফাইনালে মোহনবাগানের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সালগাওকরের গোলকিপার ব্রহ্মানন্দ। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এখনও বারের নীচে সত্যিই দুর্ভেদ্য। কিন্তু একা ব্রহ্মানন্দ কীই-বা করবেন। গোটা দলটাই কেমন যেন গুটিয়ে গেল। অথচ রোভার্স কাপে প্রথম বার ফাইনালে উঠে সালগাওকর লড়াই থেকে সরে যাবে না, এমনটাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু মোহনবাগানের আক্রমণের চাপে তারা গোটা ম্যাচে কোণঠাসা হয়েই রইল। মোহনবাগানও ফাইনাল ম্যাচটাকেই বেছে নিল সেরা খেলাটা দেখাবার জন্য। ট্যাক্টিক্যালি তারা দুর্দান্ত খেলল, বিশেষ করে মিডফিল্ডার প্রশান্ত এবং ফরিদ। ফরোয়ার্ডদের জন্য ক্রমাগত তাঁরা বল সাজিয়ে দেন। আর সেই বল নিয়ে শিশির, সুবীর এবং বাবু মানি একের পর এক ধাক্কা দেন সালগাওকর ডিপ ডিফেন্সে। অবশেষে গোলের দরজা খুলে যায়। প্রশান্তর চিপ শূন্যে পরাস্ত করে লেফ্‌ট স্টপার নরবার্টকে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে পিছন থেকে ছুটে আসেন শিশির। বল ধরে চকিতে ঠেলে দেন গোলে। দ্বিতীয় গোলটির পিছনে সব কৃতিত্ব বাবু মানির। এক ঝটকায় রাইট স্টপারকে কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে এসে তিনি বল সাজিয়ে দেন সুবীরকে। সুবীর শুধু বলটি ঠেলে দেন গোলে।

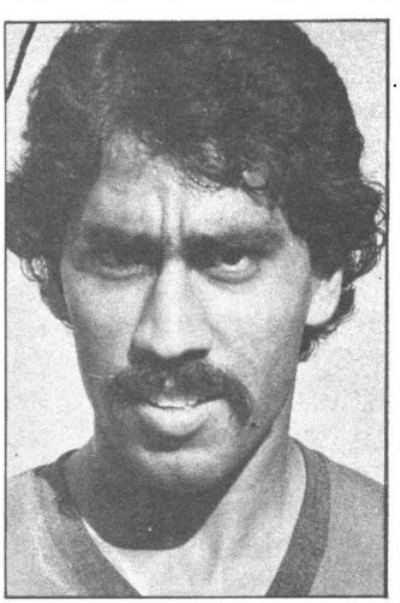

প্রশান্ত (ফাইনালে দুর্দান্ত খেললেন)

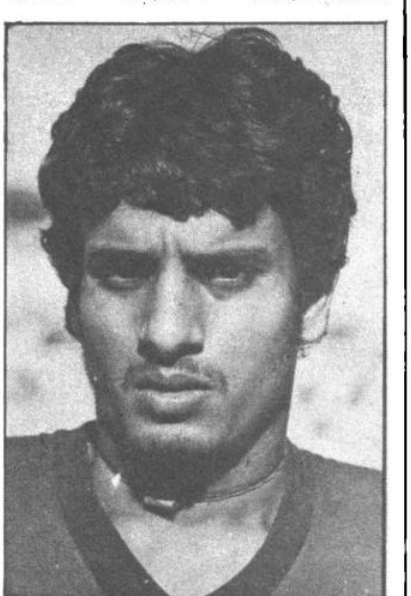

শিশির (চকিতে গোল)

সুবীর (দ্বিতীয় গোল)

ডুরাণ্ড কাপ মোহনবাগানের

সুব্রত সিংহ

পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে, এমন স্তব্ধতার মধ্যে জে· সি· টি'র পক্ষে পঞ্চম পেনাল্টি কিকটি পরমজিৎ ওয়ালিয়া বাইরে মারতেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের অবসান ঘটল এবং নির্ধারিত হয়ে গেল '৮৫ সালের ডুরাণ্ড ফাইনালের ভাগ্য। সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী সহায় হলেন মোহনবাগানের। ফাগওয়ারার জে. সি টি· মিলস্‌কে ফাইনালে টাই-ব্রেকারে হারিয়ে '৮৫'র ডুরাণ্ড কাপ পেল মোহনবাগান। নির্ধারিত নব্বুই মিনিট ও অতিরিক্ত তিরিশ মিনিটেও মোহনবাগান বা জে· সি· টি'র কোনও দলই 'গোল' না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকারের সাহায্যে খেলার নিষ্পত্তি করতে হয়েছিল।

ডুরাণ্ডে সাফল্য এই মরসুমে মোহনবাগানের দ্বিতীয় জয়। প্রথম সাফল্য হিসাবে কিছুদিন আগে তারা পেয়েছিল গ্যাংটকে গভরনরস্ গোল্ড কাপ। ওই সাফল্যে মোহনবাগান তাদের সভ্য-সমর্থকদের মুখে যতটা না হাসি ফোটাতে পেরেছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি হাসি ফুটিয়েছে ৯৮ বছরের পুরনো এই মর্যাদাপূর্ণ ডুরাণ্ড কাপ জিতে। ভারতের প্রথম সারির প্রতিযোগিতার মধ্যে ডুরাণ্ড কাপ অন্যতম। তা ছাড়া গ্যাংটকে মোহনবাগানকে তেমন কোনও শক্ত বাধা পেরোতে হয়নি। কিন্তু এই আসরে তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে একের পর এক শক্ত বাধা। তাই এই প্রতিযোগিতা জয়ের আনন্দটাই আলাদা। এ ছাড়া এই জয়ের সুবাদে জে· সি· টি'র বিরুদ্ধে তারা আগের পরাজয়ের মধুর প্রতিশোধও নিতে পেরেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, '৮৩ সালে এই ডুরাণ্ডের ফাইনালে ও এ-বছর নাগজি ট্রফির সেমিফাইনালে জে· সি· টি'র কাছে তাদের হারতে হয়েছিল।

এবার নিয়ে মোহনবাগান ১৩ বার বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করল।

মোহনবাগান ও জে· সি· টি· ভারতীয় ফুটবলের দুটি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত দল। সুতরাং ফাইনালে জবরদস্ত লড়াই দেখার আশায় আম্বেদকর স্টেডিয়ামের একটি জায়গাও খালি রাখেননি রাজধানীর ফুটবল-অনুরাগীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয়েছে তাঁদের। প্রথম থেকেই দু'দলের নামী খেলোয়াড়রা এতই স্নায়ুর চাপে ভুগেছেন, যার ফলে খেলাটির মান কোনও সময়েই তেমন উঁচু পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। খেলার সময় যেটুকু উত্তেজনা দেখা গেছে, সেটা ওই টাই-ব্রেকারের সময়টুকুতেই। তবে

কাপ-হাতে বর্তমান, পাশেই অতীত

এরই মাঝে দর্শকরা কিছুটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন দুটি দর্শনীয় শট দেখে। প্রথমটি ছিল জে· সি· টি'র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লিঙ্কম্যান পারমিন্দরের ও দ্বিতীয়টি ছিল মোহনবাগানের লিঙ্কম্যান ফরিদের। দুটি ক্ষেত্রেই দু'দলের গোলরক্ষক যথাক্রমে তনুময় ও দলজিৎ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেছিলেন।

যদিও ডুরাণ্ডে শেষ হাসিটি মোহনবাগানই হেসেছে, কিন্তু শুরুতে তারা এতই অনিশ্চয়তার মধ্যে খেলা শুরু করেছিল যে, তাদের এই সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে গ্রুপের খেলায় মাহিন্দ্র অ্যাণ্ড মাহিন্দ্রকে অতিকষ্টে ২—১ গোলে হারিয়ে পরের খেলায় অখ্যাত ইয়ং কসমসের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করে। যার ফলে সেমিফাইনালে উঠতে গ্রুপের শেষ খেলায় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বি· এস· এফের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে মোহনবাগান তাদের সুনামের সুবিচার করে বি· এস· এফকে পরিষ্কার তিন গোলে হারিয়ে। কিন্তু সেমিফাইনালে বাঙ্গালোরের আই· টি· আই'এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর টাই-ব্রেকারে জিতে তবেই ফাইনালে পৌঁছতে হয়েছিল।

অন্যদিকে জে· সি· টি· ফাইনালে পৌঁছয় কিছুটা সহজভাবে। কোয়ার্টার ফাইনালে লিগের খেলায় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে ৪—১ গোলে, গোর্খা ব্রিগেডকে ২—১ গোলে এবং টাটার সঙ্গে ২—২ গোলে ড্র করে সেমিফাইনালে উঠেছিল। সেমিফাইনালে কলকাতার তিন প্রধানের অন্যতম মহমেডানকে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল।

পরিশেষে একটি ছোট্ট অথচ মনে রাখার মতো ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। টাই-ব্রেকারে জে· সি· টি'র শেষ পেনাল্টি শট্ বাইরে যেতেই দু' হাত তুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেদিনের মাঠের হিরো তনুময়কে অভিনন্দন জানাতে মাঠের মধ্যে ছুটে গিয়েছিলেন অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় ও বর্তমান ফুটবল সচিব স্বয়ং চুনি গোস্বামী।

ছোট্ট বন্ধুরা। দারুন উত্তেজনার মুহূর্তগুলি এসে গেছে...

বুস্ট অন্তরীক্ষ অভিযান

বিখ্যাত সব মহাকাশ অভিযান ও অভিযানের নায়কদের রঙ বেরঙের ছবি সংগ্রহ কর। এড্রইন অলড্রিন চাঁদে হাঁটছেন; ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা; মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম প্রাণী লাইকা কুকুরটি এবং এরকম আরো কত ছবি!

উত্তেজনায় ভরা বুস্ট অ্যালবাম দেখতে দেখতে তোমরাও পাড়ি দিতে পার মহাকাশের মনোমুগ্ধকর জগতে।

মহাকাশ যাত্রার কাহিনী, ভবিষ্যতের অন্তরীক্ষ উপনিবেশ এবং সুদূরের নক্ষত্র ও গ্রহরাজি সম্পর্কে কতরকমের খবরই না চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হ্যাঁ, তোমাদের খুশি হওয়ার মতো আকর্ষনীয় অনেক কিছু এতে আছে। সুতরাং মহাকাশযাত্রার হেলমেট পরে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

অভিযান 1:

বিনামূল্যে কার্ড

প্রতি 500 গ্রামের প্যাকের সংগে একটি।

অভিযান 2:

12 পৃষ্ঠার এই অ্যালবামে আছে অন্তরীক্ষের আশ্চর্যময় জগতের চমৎকার চিত্র কাহিনী।

বিনামূল্যে অ্যালবাম

2 টি কার্ড সংগ্রহ করলে।

HMM-8726BEN

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

ANANDAMELA 11 DECEMBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731